হযরত মুফতী শফী (রহ.)
গ্র্যান্ড মুফতী, পাকিস্তান
শায়খুল ইসলাম তকী উসমানী

বিশ্ববাজার ধ্বসের মূল কারণ

সুদ

অনুবাদ
মাহদী হাসান

মাকতাবাতুল আখতার
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূ চি প ত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্ববাজার ধসের মূল কারণ

সুদ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَسَيِّدِ اَنْبِيَائِهٖ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنْ وَالَاهُ-

ইসলামে সুদ যে একটি অবৈধ ব্যাপার, এটা ভালোভাবে বোঝার জন্য কোন বই রচনা করার প্রয়োজন নেই। মুসলিম পরিবারের যে কোন সন্তানই এটা কমপক্ষে জানে যে, সুদপ্রথা সম্পূর্ণ হারাম। এমনকি অমুসলিম সমাজও এ ব্যাপারে অজ্ঞ নয়। সুদপ্রথাটি নতুন কোন আবিষ্কার নয়; বরং সেই জাহেলী যুগেও এ কুপ্রথাটির অবাধ প্রচলন ছিল। মক্কার কুরাইশ ও মদীনার ইহুদী গোষ্ঠীর মাঝে সুদী কারবার অবাধে চলতো। ব্যক্তিগত পর্যায়ের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যবসায়ী লেনদেনও সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। তবে হ্যাঁ, বিগত আড়াইশ' বছর থেকে নতুন এক মাত্রা এর সাথে যোগ হয়েছে। যখন থেকে ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক দুনিয়ার নেতৃত্ব দখল করে নেয় এবং ইহুদী মহাজনদের সুদী কারবারের গায়ে নতুন নতুন পোশাক পরিয়ে নতুন নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে। আর নতুন এ ধারাকে এমনভাবে প্রসার ঘটায় যে তা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যায়। অর্থনৈতিক দেহে 'সুদ' মেরুদণ্ডের স্থান দখল করে বসে। মানুষ এই ভেবে

এটাকে গ্রহণ করে নেয় যে, সুদ ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অথচ খোদ ইউরোপিয়ান মুক্তচিন্তার অর্থনৈতিক গবেষকরাও এ সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হয়েছেন যে, সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয়; বরং এটা এমন এক ধ্বংসাত্মক পোকা যা ঐ মেরুদণ্ডকে সাবাড় করে দেয়। যতদিন এ পোকা থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত না করা যাবে ততদিন আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সুদৃঢ় অবস্থানে দাঁড়াতে পারবে না। এটা কোন মৌলভীর কথা নয়, ইউরোপের প্রসিদ্ধ একজন দক্ষ অর্থনীতিবিদের উক্তি।

আজ দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ব্যবসায়ী সেক্টরে সুদের জাল এমনভাবে বিস্তৃত করে দেয়া হয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি তো দূরের কথা, একটা দলও যদি এ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে, তাহলে ব্যবসা ছেড়ে দেয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না। এর অনিবার্য ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণ ব্যবসায়ীরা আজ এই নিকৃষ্টতম সুদ থেকে বাঁচার চিন্তাও ছেড়ে দিয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম, দীনদার, পরহেযগার মুসলমান ব্যবসায়ী, যে নামায রোযা, হজ-যাকাত যথাযথ পালন করে, সব সময় আল্লাহর যিকিরে মন থাকে, গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ ও নফল আদায়ে নিজেকে নিয়োজিত করে, সে সকালে যখন তার ব্যবসায় যায়, তখন তার মাঝে আর ঐ ইহুদী মহাজনের মাঝে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তার লেনদেন, বেচাকেনা এবং ব্যবসার সব উপায়-উপকরণ ঠিক ঐ ইহুদী মহাজনের ব্যবসায়ীর উপায়-উপকরণের মতই হয়। এই যে অনাকাঙ্ক্ষিত বাধ্য বাধকতা, এটা মানুষকে ভীষণ গড্ডালিকা প্রবাহে ধাবিত করেছে। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য বা লেনদেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের আলোচনাকে বোকামী মনে করা হয়। আজকালকার আধুনিক শিক্ষিতদের পরিভাষায় মৌলবাদী(!) বলে কটাক্ষ করা হয়।

অন্যদিকে রয়েছে ধর্মীয় জ্ঞানের দৈন্যতা। ধর্মীয় জ্ঞান চর্চার যে প্রয়োজন আছে এ অনুভূতিও মানুষ আজ হারিয়ে বসেছে। ফলে অনেক মুসলমান এমনও খুঁজে পাওয়া যাবে যারা জানেই না যে, ইসলামে সুদ হারাম। সুদী কারবারের নতুন নতুন পন্থা বের হওয়ার কারণেও অনেক মুসলমান অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে বুঝতেও পারে না যে, অমুক অমুক ব্যবসা সুদী হওয়ার কারণে হারাম। অমুক অমুক ব্যবসা জুয়াবাজির কারণে হারাম। এ

সবের মধ্যে এমন লেনদেনও আছে যার প্রচলিত রূপরেখা সুদ ভিত্তিক। কিন্তু ব্যবসায়ীরা চাইলে পদ্ধতি পরিবর্তন করে সহজেই ব্যবসাকে হালালে পরিণত করতে পারেন। পন্থা-পদ্ধতি পরিবর্তনের কারণে সুদের অভিশাপ থেকে পুরোপুরি মুক্তি না পাওয়া গেলেও একটু হলেও তো মাত্রা কমবে। মুসলমান হওয়ার নিম্নতম চাহিদা হলো– একজন মুসলমান পুরো জীবনব্যাপী যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে যে, কীভাবে হারাম থেকে বেঁচে থাকা যায়। ইসলামে অনেক ব্যাপারই হারাম রয়েছে। কিন্তু সুদ এমন এক হারাম কারবার যার ব্যাপারে কুরআন মজীদে ভীষণ সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে– 'সুদ আদান-প্রদান করা যেন আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।' এ ধরনের সাবধানবাণী অন্য কোন গুনাহর ব্যাপারে উচ্চারিত হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এখানকার প্রায় পুরো ব্যবসায়ী সেক্টর মুসলমানদের হাতে চলে আসে।

১৯৪৮ খৃ. (১৩৬৭ হি.)-এর মধ্যভাগে আমি পাকিস্তানের করাচীতে হিজরত করি। ব্যবসায়ী হালাল-হারাম সম্পর্কে অগণিত অজ্ঞ লোকের মাঝে কিছু এমন দীনদার লোকও দেখলাম যাদের ব্যবসার ব্যাপারেও হালাল-হারামের চিন্তা আছে। তারা তাদের ব্যবসায় শরীয়তের বিধি-বিধান জানতে আগ্রহী। তারা লিখিতভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন পাঠাতে শুরু করেন। জবাবে তাদেরকে জানাতে থাকলাম যে, অমুক ব্যাপার সুদ, অমুক ব্যাপার জুয়া হওয়ার কারণে হারাম। অনেক ব্যাপার এমন দেখা গেল যা হারাম তো বটেই কিন্তু সাধারণ সব মুসলমান ঐ কাজে লেগে আছে (اِبْتِلَاءِ عَامْ)। এসবের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে এর উত্তম পন্থা এমনভাবে উদ্ভাবন করে দেয়া হলো, যাতে লক্ষ্য হাসিল হয়ে যায় এবং তাতে সুদ বা জুয়া কিছুই না থাকে। কিন্তু এটা একা একজন, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যবসায়ী চাইলেই বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এটা বাস্তবায়নের জন্য শীর্ষ ব্যবসায়ীদের বড় একটা দল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করতে হবে। তবেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

এজন্য আমার বক্তব্য এবং লেখা বেকার হয়েই থাকতো। কারণ যারা ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে ও যারা ইসলামী ভাবধারা মেনে চলতে চাচ্ছিল তারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য ছিল। হাতেগোনা এ ক'জন লোক মার্কেটের গতি পরিবর্তন করতে এবং ব্যবসায়ী নীতি বদলে দিতে পারবে না। তারপরও

করাচীর ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক দীনদার সৎলোক[১] সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এর জন্য কর্ম-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

কিন্তু সুদের এ সর্বগ্রাসী অভিশাপ থেকে সমাজকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করার জন্য এ ধরনের সামাজিক পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে এর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ভীষণ ক্ষতিকারক দিকগুলো অনুধাবন করে এ কাজের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এর জন্য বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় সাহসিকতার পরিচয় দিতে হবে। প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপায়-উপকরণ ব্যবহারে উদ্যোগী হতে হবে। দুর্বল জনসাধারণ বা তাদের কোন দল এ কাজ পুরোপুরি আঞ্জাম দিতে পারবে না। কুরআনে কারীম এবং হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদের ব্যাপারে যে ভীষণ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে তা অন্য কোন গুনাহর ব্যাপারে উচ্চারিত হয়নি। বলা হয়েছে– 'সুদ'-এর ভিত্তিতে লেনদেন করা মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ভীষণ এ অভিশাপ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার আপত্তি তুলে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা ছেড়ে দেয়ার কোনই অবকাশ নেই। এতে মুসলমানদের জন্য ফরয যেন সে এ ধ্বংসাত্মক অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। এমনকি এ চেষ্টা আজীবন করে যাবে। যদিও বাজারকে পরিপূর্ণ সুদমুক্ত করতে না পারে, কমপক্ষে সুদের অভিশাপ কমিয়ে আনার চেষ্টা সব সময় করে যাবে। সফলতা আসুক বা না আসুক। বাজারের গতি পরিবর্তন করা কারো সাধ্যে নেই। কিন্তু এজন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার নামে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এ পুস্তিকা প্রণয়ন করা হলো। এতে 'রিবা' বা সুদের শরয়ী সংজ্ঞা, তার প্রকার-প্রকরণ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বিধান বিস্তারিতভাবে

[১]. এ কাজের জন্য যারা প্রথমে একত্রিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন– হাজী ইউসুফ সাহেব সিথী টেক্সটাইল মিল, করাচী, হাজী আবু বকর ইসমাঈল। জামিল ট্রেডিং কোম্পানী, করাচী, হাজী শরীফ সাহেব, শিপটন টি কোম্পানী, করাচী, হাজী নবী সাহেব, ক্যামিস্ট, হাজী ইউসুফ সাহেব, তাজ রেস্টুরেন্ট করাচী, হাজী ইউসুফ, সওদাগর সামরিকী, করাচী, হাজী আবদুল্লাহ, বোল্টন মার্কেট, করাচী। মাওলানা ইউসুফ মহল্লা সাহেব করাচী। পরে এদের সাথে আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেন।

আলোচিত হয়েছে। যেন মানুষ কমপক্ষে জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। ইচ্ছা আছে, এরপর অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক মূলনীতির ভিত্তিতে সুদের যৌক্তিক অসারতা এবং তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করবো। সুদমুক্ত ব্যাংকিং বাস্তবভিত্তিক একটা ধারণা শরয়ী মূলনীতির আলোকে উপস্থাপন করবো। সাথে সাথে জীবনবীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর শরয়ী অবস্থান, জুয়াড়ির জরুরি বিধি-বিধান। এছাড়া আরও যত প্রচলিত সুদ ও জুয়া সংশ্লিষ্ট লেনদেন রয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা, এসব লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ ও জুয়া থেকে বাঁচার সম্ভাব্য পন্থা সম্পর্কেও আলোচনার ইচ্ছা আছে। চাই বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় হোক বা আলাদা পুস্তকাকারে হোক।

আলহামদুলিল্লাহ! এ পুস্তিকার দ্বিতীয় মুদ্রণের সময় এসব লেখা সবগুলোই তৈরি হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কোনটার ছাপার কাজ চলছে। পুস্তিকাগুলো হলো–

১. সম্পদ বন্টনের ইসলামী ভাবধারা।
২. সুদমুক্ত ব্যাংকিং।
৩. জীবন বীমা।
৪. প্রভিডেন্ট ফান্ড।
৫. জুয়া এবং ইসলাম।

এসব লেখার উদ্দেশ্য

যখন আমি এসব বিষয় নিয়ে লিখছি, মানুষ তখন দীন এবং দীনি বিধি-বিধানের ব্যাপারে ভীষণ উদাসীন। অবস্থা যদি এই হয়, সেখানে আমার এ নগণ্য কাজ হাজার হাজার বাদ্য-বাদকের মজলিসে তোতা পাখির আওয়াজের মতোই শোনাবে। এ দ্বারা বাজারকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে কতটুকু সাহায্য পাওয়া যাবে? আজকালকার বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে এ কাজের বিনিময়ে যে অপবাদের ঝুড়ি কাঁধে এসে পড়বে তাতে কাজের উৎসাহ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কলম থেমে যেতে চায়।

কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! এর কিছু উপকারের বিষয়টি চিন্তা করলে ঐ হীনমন্যতা পরাজিত হয়ে যায়। আর এ জন্যই এ পুস্তিকার আয়োজন। আল্লাহ সহায়, উপকারগুলো হলো–

এক. মুসলমানদের মধ্যে হারামকে হারাম জানা হালালকে হালাল জানার জ্ঞান আসা, দুনিয়া-আখেরাতের জন্য বিপজ্জনক হওয়ার অনুভূতি জাগ্রত হওয়া একটা বড় উপকার। রোগী যদি তার রোগ পরিচয় করতে পারে, তবে সম্ভাবনা আছে। সে হয়তো কখনও ডাক্তারের কাছে গিয়ে এর চিকিৎসা নিয়ে ভালো হয়ে যাবে। প্রত্যেক ব্যাপারেই মুসলমানদের দুটো কর্তব্য রয়েছে। এটা হলো– সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কুরআন হাদীস থেকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করবে। আরেকটি হলো– সে অনুযায়ী আমল করা। অসাবধানতা বা কোন সামাজিক কারণে এক ব্যক্তি কোন গুনাহে লিপ্ত রয়েছে। তাকে কমপক্ষে তার গুনাহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা দরকার। সে যেন জানতে পারে যে, সে যে কাজ করছে তা গুনাহর কাজ। নতুবা একটি গুনাহ দুটো গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একটি জ্ঞান না থাকার গুনাহ। আরেকটি হলে গুনাহর কাজ করা। একজন গুনাহগার যদি নিজেকে গুনাহগার বা পাপী মনে করে তাহলে কোন না কোন সময় সেই গুনাহ থেকে তাওবা করার তৌফিক সে পেয়ে যেতে পারে।

দুই. উদাসীন কোন রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে ধারণা দিলে সে চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তেমনি কোন মুসলমানকে তার গুনাহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করলে, তার পার্থিব ও পারলৌকিক মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ধারণা দিলে, প্রথমত কমপক্ষে তার মধ্যে ঐ গুনাহ থেকে বাঁচার একটা চিন্তা আসবে। আর এই চিন্তা কখনও মানুষকে দৃঢ় সংকল্পের দিকেও ধাবিত করে। যা এমন একটা শক্তি যে, সেটা তার গন্তব্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়কেও জয় করে সফলতা ছিনিয়ে এনে দেয়।

তিন. ইসলামের অলৌকিক একটা দিক হলো– তা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। দুনিয়াতে যত খারাপ যুগই আসুক না কেন, মূর্খতা আর উদাসীনতা যতই সংক্রমিত হতে থাকুক, সত্যে অবিচল থাকার পথে সামাজিক যত বাধাই কাজ করুক, তারপরও প্রতিটি যুগেই সত্যের

ধ্বজাবাহী মর্দে মুমিনদের একটা জামাত সক্রিয় থাকবে। (তাদের সাথে থাকবে আল্লাহর সাহায্য। তাদেরকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না)। আর কিছু না হলেও তাদের জন্য তো এ পুস্তিকা পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। তারা তো এটা দেখে তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হবে।

সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আবেদন

রচনা শুধু ছেপে দিলেই লক্ষ হাসিল করা যাবে না। সাধারণ মুসলমান বিশেষ করে ব্যবসায়ী মুসলমান ভাইদের হাতে হাতে পৌছে দেয়ার কাজও আঞ্জাম নিতে হবে। সুতরাং যারা এর গুরুত্ব বোঝেন তারা এ কাজকে দাওয়াতী কাজ মনে করে এর প্রতি দৃষ্টি দেবেন বলে আশা রাখি। (আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী আর ভরসাও শুধু তাঁর উপর।)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'রিবা'-এর সংজ্ঞা এবং সুদ-রিবার পার্থক্য

কুরআন মজীদে যে সব বিষয়কে 'রিবা' শব্দটি হারাম ঘোষণা করেছে, তাকে আমরা উর্দু (এবং বাংলা) ভাষার সংকীর্ণ শব্দ-ভাণ্ডারের কারণে সাধারণ 'সুদ' বলে ভাষান্তর করে থাকি। ফলে সবাই বোঝে যে, 'রিবা' আর 'সুদ' একই জিনিস। কিন্তু আসলে তা নয়। বরং 'রিবা' প্রশস্ত অর্থবোধক একটি শব্দ। যার পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত। প্রচলিত সুদ তার একটা প্রকার মাত্র।

'সুদ' বলা হয়– 'নির্দিষ্ট অংকের টাকা সুনির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট অংকের টাকার সাথে লাভ নামে বাড়তি কিছু টাকা পরিশোধের সময় উসল করা।' এটাও রিবার সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু শুধু এটাকেই রিবা বলে না। বরং এর সংজ্ঞায় আরো বিষয় রয়েছে। তাতে বেচাকেনা সংক্রান্ত এমন অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার ভেতর ঋণের কোন ব্যাপারই নেই। জাহেলী যুগেও আমরা যেটাকে সুদ বলি তাকেই

তারা রিবা ধারণা করতো। অর্থাৎ দশ টাকা ঋণ দিয়ে বার টাকা আদায় করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিবা'র অর্থ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়ে এমন সব লেনদেনকেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেন, যার মধ্যে ঋণের কোন ব্যাপারই নেই।

'রিবা'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- বাড়তি জিনিস, শরীয়তের পরিভাষায়- আর্থিক বিনিময় ছাড়া যে বাড়তি অংশ অর্জন করা হয়।

اَلرِّبَا فِى اللُّغَةِ وَالزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ فِى الْاٰيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ- (اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ اِبْنُ الْعَرَبِى)

এ সংজ্ঞায় ধারের বিনিময়ে নেয়া বাড়তি টাকা ও অন্তর্ভুক্ত। কেননা টাকার বিনিময়ে মূল টাকা তো পুরোই ফেরত পাওয়া যায়। যে বাড়তি টাকা সুদ বা ইন্টারেস্টের নামে নেয়া হয়, তা বিনিময়হীন বেচাকেনা সংক্রান্ত ঐসব বিনিময়হীন বাড়তি অংশও এর ভেতর অন্তর্ভুক্ত। বক্ষ্যমাণ রচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আরবের জাহেলী যুগের লোকেরা শুধু ঋণের ক্ষেত্রে বাড়তি গ্রহণ করাকে 'রিবা' বলতো। অন্যগুলো 'রিবা' মনে করতো না।

'রিবা'র বিভিন্ন অবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। তৎকালীন আরবে প্রথা ছিল- নির্ধারিত অংকের টাকা নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্ধারিত সুদের ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতাকে দেয়া হতো। সে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করলে নির্ধারিত সুদ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হতো। আর নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদের পরিমাণ দিন দিন বাড়তে থাকতো। মোট কথা, কুরআন নাযিলের সময় 'রিবা' বলতে ঋণের উপর আরোপিত সুদকেই বুঝানো হতো। রিবার সংজ্ঞা একটি হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبوا

যে ঋণ লাভ কামাই করে সেটা 'রিবা'।

হাদীসটি আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) 'জামিউস্ সগীর' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। 'জামিউস্ সগীরে'র ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফয়জুল কাদীর'-এ হাদীসটির সনদের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সনদের সূত্র দুর্বল। কিন্তু কিতাবটির অন্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'সিরাজুল মুনীর'-এ আল্লামা আজিজী (রহ.) হাদীসটির সনদের ব্যাপারে বলেন-

قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ

অর্থাৎ 'হাদীসটি 'হাসান লি-গাইরিহী'।

কেননা এ হাদীসের সারকথা অন্যান্য হাদীস কর্তৃক সমর্থিত। মোট কথা, হাদীস বিশারদগণের মতে, এ হাদীস আমলযোগ্য। সুতরাং এটা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। রিবার এ ব্যাখ্যা আরবে তখন থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। এ হাদীসটিও যদি না থাকতো তবুও আরবী ভাষা এ অর্থটি প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হতো। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা আসবে। এ পুস্তকের শেষে 'রিবা' সম্পর্কিত সাতচল্লিশটি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নম্বর হাদীসে ঐসব লোকদেরকে কোন ধরনের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যারা ঋণদাতা। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার উপহার গ্রহণ করবে না। যদি আগে থেকে তাদের মাঝে উপহার আদান-প্রদানের পরিবেশ না থাকে। কেননা, এ দ্বারাও ঋণদাতা তার ঋণের কারণে এক ধরনের লাভ কামাই করছে। এ থেকেও বুঝা গেল ঋণের কারণে অর্জিত প্রত্যেক বাড়তি অংশ গ্রহণ করা রিবার অন্তর্ভুক্ত। চাই সেটা ব্যক্তিগত হোক বা সামাজিক এবং ব্যবসায়ী হোক। ৪৬ নং হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রিবার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন-

اَخِّرْ لِى وَاَنَا اَزِيْدُكَ

অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে বললো, তুমি পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দাও, তাহলে আমি এত টাকা বাড়িয়ে দেব। বুঝা গেল, ঋণ পরিশোধের

সময় বাড়ানোর বিনিময়ে যে বাড়তি টাকা দেয়ার কথা বলা হলো, এ বাড়তি অংশ রিবার অন্তর্ভুক্ত। আরবের তৎকালীন সমাজে রিবা সম্বলিত লেনদেনের খুব প্রচলন ছিল। ইসলামের শুরুতেও সে গতি চলমান ছিল। মদীনায় হিজরতের ৮ম বছরে মক্কা বিজয়ের সময় রিবার আয়াত নাযিল হয়। তাতে রিবা হারাম ঘোষণা করা হয়।

কুরআনের আয়াত শুনেই রিবার পরিচিত অর্থ 'ঋণের বিনিময়ে লাভ নেয়া'– এটা সবাই বুঝে ফেলে। আর সেটাকে হারাম মনে করে সাথে সাথেই প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্পিত দায়িত্ব পালনার্থে আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা শুরু করেন। ব্যাখ্যায় তিনি সবার জমা অর্থের চাইতে আরো ব্যাপক অর্থের কথা উল্লেখ করেন। সবাই রিবা বলতে ঋণের বিনিময়ে লাভ গ্রহণ মনে করতো। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যায় আরো অনেক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেন।

অন্য ধরনের রিবার বর্ণনা দিতে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبٰى اَلْاٰخِذُ وَالْمُعْطِىْ فِيْهِ سَوَاءٌ- (مُسْلِمٌ عَنْ ابى سعيد)

অর্থাৎ 'স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবণের বদলে লবণ যদি লেনদেন করা হয় তাহলে নগদ এবং পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। তাতে কম বেশি করা বাকিতে অদল বদল করা রিবার অন্তর্ভুক্ত। দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই গুনাহগার হবে।' [মুসলিম]

হাদীসটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদে প্রায় সব হাদীসের কিতাবে বিভিন্ন শিরোনামে সংকলিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে নতুন আরেকটি

রিবার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। হাদীসে বর্ণিত ছয়টি জিনিসের কোন এক ধরনের জিনিস পরস্পর অদল-বদল বা বেচাকেনা করলে তখন পরিমাণে কম বেশি করা যাবে না এবং লেনদেন বাকীতেও করা যাবে না। করলে রিবা হয়ে যাবে। যদিও বাকীর ক্ষেত্রে পরিমাণে বেশ কম না হয়। রিবার প্রসিদ্ধ রূপ 'ঋণে বাড়তি আদায়'-এর ব্যাপারে সবার ধারণা আগে থেকেই ছিল। যা আয়াত শুনার সাথে সাথেই সাহাবায়ে কিরাম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু রিবার এ নতুন ধরন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাখ্যার আগে কারোরই জানা ছিল না।

এমনকি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত ফিকাহবিদ সাহাবীও শুরুতে রিবার বিস্তৃত অর্থ বুঝতে পারেনি। কিন্তু যখন আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়াত শোনেন তখন তিনি তাঁর পূর্বমত পরিবর্তন করেন এবং ভুলের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। [নাইলুল আওতার]

রিবার ব্যাখ্যায় হযরত উমর (রা.)-এর মত

আলোচ্য হাদীসের বর্ণনা রিবার এমন একটি ধরন যার ব্যাখ্যা নির্ণয়ে হযরত উমর (রা.)-এর মনে কিছু প্রশ্ন দেখা দিল। কেননা, হাদীসে শুধু ছয়টি জিনিসের নাম এসেছে এবং এগুলো লেনদেনের ক্ষেত্রে কম বেশি করা এবং বাকীতে লেনদেন করাকে 'রিবা' বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীসের বাক্যগুলোতে এটা স্পষ্ট নয় যে, বিনিময়ের ক্ষেত্রে কম বেশি করলে রিবা হবে– শুধু এ ছয়টি জিনিসের ক্ষেত্রে না কি এ ছয়টি জিনিসকে শুধু মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এ ছয়টি জিনিস ছাড়াও আরও সব জিনিস তার অন্তর্ভুক্ত।

রিবার বিধান নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ জীবনে নাযিল হয়। এ সম্পর্কিত উপরের হাদীসের বিস্তারিত মাসআলা তাঁর থেকে বুঝে নেয়ার সুযোগ হয়নি। এ জন্য উমর (রা.) এ ব্যাপারে তাঁর আফসোস প্রকাশ করেছেন এবং বলেন– হায় আফসোস! যদি আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে এর পুরো ব্যাখ্যা বুঝে নিতাম! এর সাথে আরও কয়েকটি মাসাইল এমন রয়েছে যার ব্যাপারে বিস্তারিত

ধারণা আমরা নিতে পারিনি। সবগুলোর ব্যাপারেই হযরত উমর (রা.) আফসোস প্রকাশ করেন। তাঁর আফসোস প্রকাশের ভাষা ছিল এমন–

ثَلَاثٌ وَدِدتُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اِلَيْنَا فِيْهِنَّ عَهْدًا اَلْجَدَّ وَالْكَلَالَةُ وَالْبَوَابُ مِنْ اَبْوَابِ الرِّبٰى- (ابن ماجه و ابن كثير وابن مردوية)

অর্থাৎ তিনটি মাসআলার ব্যাপারে আমার ইচ্ছা রয়ে গিয়েছে। আফসোস! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব ব্যাপারে যদি আরও বিস্তারিত বর্ণনা দিতেন। দুটো মাসআলা হলো উত্তরাধিকার সম্পর্কে আর তৃতীয়টি হলো রিবার কোন কোন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে। [ইবনে মাজা, ইবনে কাসীর]

হযরত উমর (রা.)-এর এ উক্তিতে রিবার ব্যাখ্যা সম্পর্কেও বিস্তারিত না জানার আফসোসের অর্থ হলো– হাদীসে উল্লেখিত ছয়টি জিনিসই কি রিবার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ? নাকি এ ছয়টি জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণস্বরূপ বলেছেন? যদি উদাহরণস্বরূপ বলেন তাহলে তো আরও অন্যান্য জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদি আর জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে অন্য জিনিস অন্তর্ভুক্ত করার বিধান কী?

এ কারণেই পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ– ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) যার যার গবেষণা অনুযায়ী এসব ব্যাপারে একটা মূলনীতি দাঁড় করান। যার ভিত্তিতে অন্যান্য জিনিসকে এর অন্তর্ভুক্ত করেন। যার বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহর কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

মোট কথা, ঋণের বিনিময়ে লাভ নেয়া তো প্রথম থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনায় ব্যবসায়ী বিভিন্ন অবস্থাও রিবা হিসেবে ঘোষিত হয়।

এজন্য উলামায়ে কিরাম সাধারণত বলে থাকেন, রিবা দুই প্রকার। এক. রিবান্নাসিয়া বা রিবাল জাহিলিয়াহ, দুই. রিবাল বাই বা রিবাল ফদ্‌ল। প্রথম

প্রকারকে রিবাল কুরআনও বলা হয়; আর দ্বিতীয় প্রকারকে রিবাল হাদীসও বলা হয়ে থাকে।

'রিবাল জাহিলিয়া' কী

আগে বলা হয়েছে, জাহিলী যুগের পরিভাষায় ঋণের বাড়তি টাকা বা সময় বাড়ানোর বিনিময়ে বাড়তি টাকাকে রিবা বলা হতো। এটাই 'রিবাল জাহিলিয়া' বা জাহিলী যুগের রিবা নামে পরিচিত।

এখন এ ধরনের রিবাকে আমরা অভিধান, তাফসীর ও হাদীস বিশেষজ্ঞদের ভাষায় খুঁজে দেখি–

১. লিসানুল আরব

আরবী ভাষার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য অভিধান। এতে রিবা অর্থ করা হয়েছে–

اَلرِّبَا رِبْوَانِ وَالْحَرَامُ كُلُّ قَرْضٍ يُؤْخَذُ بِهِ اَكْثَرُ مِنْهُ اَوْ يَجُرُّ بِهِ مَنْفَعَةً-

অর্থাৎ 'রিবা' দুই প্রকার এবং হারাম। ঋণের বিনিময়ে কিছু বেশি নেয়া বা ঋণের বিপরীতে লাভ নেয়া।

২. নেহায়াহ্-লি-ইবনিল আসীর

হাদীসের ভাষার একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ। তাতে রিবা সম্পর্কে বলা হয়–

تَكَرَّرَ ذِكْرُ الرِّبَا فِى الْحَدِيْثِ، وَالْاَصْلُ فِيْهِ الزِّيَادَةُ عَلٰى رَأْسِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ-

অর্থাৎ 'রিবা'র আলোচনা হাদীসে বারবার এসেছে। মূলত বেচাকেনার চুক্তি ছাড়া আসল টাকার উপর বেশি নেয়াকে রিবা বলে।

৩. তাফসীরে ইবনে জরীর তাবারী

তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য গ্রন্থ মনে করা হয়। সেখানে রিবার পরিচিতি এভাবে দেয়া হয়েছে–

وَحُرِمَ الرِّبَا يَعْنِى الزِّيَادَةُ الَّتِىْ يُزَادُ لِرَبِّ الْمَالِ بِسَبَبِ زِيَادَةِ عَزِيْمَةٍ فِى الْاَجَلِ وَتَاخِيْرِ دَيْنِهٖ عَلَيْهِ۔

অর্থাৎ 'রিবা' হারাম। রিবা হলো, ঐ বাড়তি টাকা যা টাকার মালিক ঋণগ্রহীতাকে তার ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয়ার বিনিময়ে গ্রহণ করে।

৪. তাফসীরে মাযহারী

হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য তাফসীর। তিনি তার তাফসীরে রিবাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন–

اَلرِّبٰوا فِى اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ۔ وَالْمَعْنٰى اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الزِّيَادَةَ فِى الْقَرْضِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَدْفُوْعِ۔

অর্থাৎ 'রিবা'র আভিধানিক অর্থ বাড়তি অংশ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন– আল্লাহ তাআলা দানসমূহকে বাড়িয়ে দেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা ঋণের ক্ষেত্রে দেয়া টাকার চাইতে বেশি নেয়াকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

৫. তাফসীরে কাবীর

ইমাম রাযীর (রহ.) বিখ্যাত তাফসীর। এতে তিনি 'রিবা' সম্পর্কে বিস্ত
রিত আলোচনা করেন–

اِعْلَمْ اَنَّ الرِّبٰوا قِسْمَانِ، رِبَا النَّسِيْئَةِ وَرِبَا الْفَضْلِ

اَمَّا رِبَا النَّسِيْئَةِ فَهُوَ الْاَمْرُ الَّذِىْ كَانَ مَشْهُوْرًا مُتَعَارَفًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَذٰلِكَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَدْ فَعُوْنَ الْمَالَ عَلٰى اَنْ يَّاْخُذُوْا كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا وَتَكُوْنَ رَاْسُ الْمَالِ بَاقِيًا ثُمَّ اِذَا حَلَّ الدَّيْنُ طَالَبَهَا الْمَدْيُوْنُ بِرَاْسِ الْمَالِ فَاِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْاَدَاءُ زَادُوْا فِى الْحَقِّ وَالْاَجَلِ فَهٰذَا هُوَ الرِّبٰوا الَّذِىْ كَانُوْا فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَتَعَا مَلُوْنَ بِهٖ۔ وَاَمَّا رِبَا النَّقْدِ فَهُوَ اَنْ يُّبَاعَ مِنَ الْحِنْطَةِ بِمَنَوَيْنِ مِنْهَا وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ۔

অর্থাৎ জেনে রাখ, রিবা দুই প্রকার। এক. ঋণের রিবা। দুই. নগদে বাড়তি অংশের রিবা। জাহিলী যুগে ঋণের যে রিবা প্রচলিত ছিল, তাই ঋণের রিবা। যার ধরন ছিল, লোকেরা এ শর্তের উপর ঋণ দিত যে, এ ঋণের বিপরীতে মাসে এত টাকা করে দিতে হবে। আর মূল টাকা অবশিষ্ট থাকবে। যখন পরিশোধের সময় হতো তখন ঋণগ্রহীতা থেকে মূল ঋণের টাকা চাইতো। ঋণগ্রহীতা যদি সময় মতো টাকা পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করতো, তাহলে তার সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদও বাড়িয়ে দিত। রিবার এ ধরনটা জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। আর রিবার ফদল হলো– যার বর্ণনা হাদীসে এসেছে। এক মণ গমের বদলে দুই মণ গম নেয়া। এভাবে অন্যসব পণ্য।

৬. আহকামুল কুরআন

আল্লামা ইবনুল আরবী মালিকী (রহ.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে তিনি রিবা সম্পর্কে বলেন–

وَكَانَ الرِّبٰوا عِنْدَهُمْ مَعْرُوْفًا (اِلٰى) اَنَّ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ مُجْمِلَةٌ فَلَمْ يَفْهَمْ مَقَاطِعَ الشَّرِيْعَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ اِلٰى قَوْمٍ هُوَ مِنْهُمْ بِلُغَتِهِمْ

وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهٗ تَيْسِيْرًا مِّنْهُ بِلِسَانِهٖ وَلِسَانِهِمْ
وَالرِّبَا فِى اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ فِى الْاٰيَةِ كُلُّ
زِيَادَةٍ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ-

অর্থাৎ আরবে 'রিবা' শব্দটি প্রসিদ্ধ ছিল। যে মনে করে, আয়াতটি খুবই সংক্ষিপ্ত, সে শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য বুঝে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে এমন এক জাতির কাছে পাঠিয়েছেন তিনি যাদের স্বজাতি ছিলেন, তাদের ভাষায়ই তিনি কথা বলতেন। তাদের ভাষায়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর কালাম কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করেন। যেন তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আরবী ভাষায় রিবা অর্থ 'বাড়ানো'। এ দ্বারা ঐ বাড়তি অংশ বুঝায়, যার বিপরীতে আর্থিক কোন বিনিময় নেই। (যেমন- ঋণের বিনিময়ে লাভ নেয়া।)

৭. আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস

আল্লামা আবু বকর জাস্সাস (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতে তিনি রিবা সম্পর্কে বলেন–

فَمِنَ الرِّبَا مَاهُوَ بَيْعٌ وَمِنْهُ مَالَيْسَ بَيْعٌ وَهُوَ رِبَا
اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ الْاَجَلُ
وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ-

অর্থাৎ রিবা দুই প্রকার। এক. যা ব্যবসায় হয়। দুই. যা ব্যবসায় নয়। এটাই জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। যার ধরন ছিল, নির্ধারিত মেয়াদে এই শর্তে ঋণ দেয়া হতো যে, ঋণগ্রহীতা পরিশোধের সময় মূল টাকার সাথে বাড়িয়ে পরিশোধ করবে।

৮. বিদায়াতুল মুজতাহিদ

আল্লামা ইবনে রুশদ্ মালিকী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'-এ রিবার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন–

رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِىْ نُهِىَ عَنْهُ وَذَالِكَ اَنَّهُمْ كَانُوْا
يُسْلِفُوْنَ بِالزِّيَادَةِ فَيَنْظُرُوْنَ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ
اَنْظِرْنِىْ اَزِدْكَ وَهٰذَا هُوَالَّذِىْ مَنَعْنَاهُ بِقَوْلِهٖ فِىْ
حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اَلَا اَنَّ رِبَاالْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ-

অর্থাৎ রিবাল জাহিলিয়া হলো, যে ব্যাপারে কুরআনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এর ধরন হলো, লোকেরা ঋণের উপর বাড়তি দেয়ার শর্তে ঋণ দিত। নির্ধারিত সময়কে বাড়ানোর বিনিময়ে আবার বাড়তি টাকা যোগ করে দিত। যা ঋণগ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হতো। এটা ঐ রিবা যেটাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে পরিত্যক্ত ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

উপরের এসব উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, 'রিবা' শব্দটি একটা বিশেষ লেনদেনের জন্য কুরআন নাযিলের আগে থেকেই আরবী ভাষাভাষীদের মাঝে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরবে যে লেনদেনের সাধারণ প্রচলন ছিল। ঋণের বিনিময়ে লাভ নেয়াকেই আরবের লোকেরা 'রিবা' বলতো এবং বুঝতো। ঐ রিবাকেই কুরআন মজীদ অবৈধ ঘোষণা করে। এটাকেই বিদায় হজের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রিবাল জাহিলিয়া' নামে অভিহিত করে অবৈধ ঘোষণা করেন।

তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে–

وَذَالِكَ اَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعْرِفُ رِبًا اِلَّا ذَالِكَ (اِلٰى
فَحَرَّمَ سُبْحَانَهٗ ذَالِكَ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهٖ: وَاَحَلَّ اللّٰهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (ثُمَّ قَالَ) وَهٰذَا الرِّبَا هُوَ الَّذِىْ
نَسَخَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهٖ لَهٗ
يَوْمَ عَرَفَةَ: اِلَّا اَنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوْعٌ-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আরবের লোকেরা 'ঋণের বিনিময়ে লাভ নেয়া' এটা ছাড়া অন্য কিছুকে 'রিবা' মনে করতো না। তারপর আল্লাহ তাআলা এটাকে

হারাম করেছেন। ইরশাদ করেন– 'আল্লাহ্ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর রিবাকে হারাম করেছেন।' আর এই 'রিবা' যেটাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানে রহিত ঘোষণা করেন, এই বলে– হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! জেনে রাখ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক 'রিবা'কে রহিত করা হলো।

রিবার আয়াতে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। এমন সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও ছিল না যে, তা বুঝতে অসুবিধা হয়। তাই সবাই সহজেই বুঝে যায় এবং সাথে সাথে তার উপর আমল শুরু করে দেয়। তারপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতকে ব্যাখ্যা করে শোনান এবং আল্লাহর নির্দেশে আরও কয়েকটি বিষয় যোগ করেন। ছয়টি পণ্যের পারস্পরিক লেনদেনে কম বেশি করা, বাকীতে বিনিময় করাকেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেন। এ ধরনের রিবাকে রিবা'ল ফদ্ল বা রিবান্নাক্দ ইত্যাকার নামে নামকরণ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাখ্যায় এই যে রিবাল ফদ্ল, এটা জাহিলী সমাজে প্রসিদ্ধ রিবার ব্যাখ্যা থেকে বাড়তি একটা বিষয়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করেননি। তাই এর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা.) অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। পরিশেষে গবেষণার (اِجْتِهَاد) মাধ্যমে সাবধানতার পথ ধরে যে ব্যাপারে রিবার গন্ধ পর্যন্ত পেয়েছেন তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। হযরত উমর (রা.) ঘোষণা করেন–

فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ

অর্থাৎ সুদ ছেড়ে দাও এবং যার মধ্যে সুদের সামান্য সন্দেহ হবে তাও ছেড়ে দাও।

সংশয় ও ভুল ধারণা

সুদের ব্যাপারে অনেকে উমর (রা.)-এর উক্তির সামনে একটা দেয়াল দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তারা বলে, তিনি বিশেষ ধরনের লেনদেনের ব্যাপারে এটা বলেছেন। এ যুগে প্রচলিত সুদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

ছয়টি পণ্যের পরস্পর লেনদেনের ব্যাপারে ইরশাদে রাসূল একটু আগে যা বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে তারা বলে থাকে যে, সুদের বিষয়ে আলোচনা স্পষ্ট নয়। এটা স্পষ্ট অনুধাবনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এ সুদ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার সবই ফেকাহবিদদের ইজতিহাদ আর গবেষণা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমি ইতোপূর্বে স্পষ্ট বলেছি, হযরত উমর (রা.) শুধু ঐ সুদের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যা কুরআনে স্পষ্ট হয়নি এবং আরবী সমাজে যাকে সুদ বলা হতো না। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা সেসব বিষয়কে রিবা বা সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়, যে বর্ণনায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি পণ্যের উল্লেখ করেছেন। এর প্রত্যেকটি পণ্যের বিনিময়ে হুবহু পণ্য লেনদেন করলে পরিমাণে কম বেশি করা যাবে না বলে ঘোষণা করেন। যেমন- আটা। এক কেজি আটার বিনিময়ে দেড় কেজি আটা কেনা যাবে না। এটা অবৈধ।

আজকাল যে 'সুদ' প্রচলিত রয়েছে এর সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। জাহিলী যুগ থেকে আরবে এ প্রথা চলে আসছে। ইসলামের শুরুতেও চালু ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) এবং একদল সাহাবা (রা.) এ ধরনের কারবারে জড়িত ছিলেন। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজের ভাষণে এ সংক্রান্ত কুরআনী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করতে হয়েছে। তিনি বলেন– তোমাদের মধ্যে যারা ইসলামপূর্ব যুগ থেকে সুদী কারবারের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছো, তারা তোমাদের সুদের অংশ বাতিল করে দাও, শুধু মূলধন লেনদেন কর। রিবা ও সুদ সম্পূর্ণ অবৈধ।

ছয়টি পণ্যের সুদের ব্যাপারে হযরত উমর (রা.)-এর সামনে যে প্রশ্ন দেখা দিল, তা সুদ বৈধ না অবৈধ এ ক্ষেত্রে নয়। বরং প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল এ ক্ষেত্রে যে, রিবা শুধুই কি এ ছয়টি পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না কি সবক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য এবং ছয়টি পণ্যের উল্লেখ শুধুই উদাহরণস্বরূপ? এমতাবস্থায় হতে পারে যে, অন্যান্য পণ্যের বেচাকেনাতেও সুদ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। এজন্যই হাদীসে হযরত উমর (রা.)-এর উক্তি সংকলিত হয়েছে এভাবে– 'আমরা রিবা-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জেনে রাখতে পারিনি। (শেষে তিনি বলেন)- সুতরাং তোমরা রিবা এবং রিবার সন্দেহ যাতে পাও তা প্রত্যাখ্যান কর। [ইবনে মাজাহ, দারমী] অর্থাৎ এই অস্পষ্টতার কারণে মুসলমানদের উচিত, রিবাকে তো ছাড়বেই, এমনকি রিবার সন্দেহ যেখানে হবে- তাও ছেড়ে দিতে হবে।

হযরত উমর (রা.)-এর চিন্তাধারা শুধু চিন্তার সীমানায় আবদ্ধ থাকেনি। চিন্তার গণ্ডি পেরিয়ে তিনি তা বাস্তবতায় রূপান্তরিত করেন। এটাকে তিনি তাঁর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মূলনীতি ঘোষণা করেন। ইমাম শাফিঈ (রহ.) এ সংক্রান্ত হযরত উমর (রা.)-এর উক্তি উপস্থাপন করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন-

تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرِّبٰوا-

> অর্থাৎ আমরা নব্বই শতাংশ লেনদেন এ জন্য ছেড়ে দিয়েছি যে, তাতে সুদের আশংকা ছিল।

আশ্চর্য! চিন্তা করার বিষয়, হযরত উমর (রা.) সন্দেহের কারণে স্পষ্ট ব্যাপার ছাড়াও অস্পষ্ট ব্যাপারেও লেনদেনের ক্ষেত্রে সাবধনতা অবলম্বন করে তা থেকে দূরে থাকলেন। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষিত ছয়টি পণ্যকে উদাহরণ ধরে এ ধরনের লেনদেনকে সবক্ষেত্রে রিবা বলে আখ্যায়িত করেন।

দ্বিতীয় সংশয় : ব্যক্তিগত সুদ এবং ব্যবসায়ী সুদের পার্থক্য

অনেক শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোককেও এ সংশয়ে ভুগতে দেখা যায় যে, কুরআনে রিবা সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা প্রাচীন আরবে প্রচলিত সুদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। কোন দরিদ্র বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কারো থেকে ঋণ নিল। ঋণদাতা তার এ বিপদের সুযোগে তার থেকে সুদ গ্রহণ করে। এটা সুস্পষ্ট জুলুম। ভাইয়ের বিপদে সুযোগ খোঁজা এটা অমানবিক কাজ। আজকালকার প্রচলিত সুদ এর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ ঋণগ্রহীতা যে সুদ দেয় সে তো দরিদ্র নয়। সে বিপদগ্রস্ত নয়। বরং ধনী। পুঁজিপতি এবং

ব্যবসায়ী। দরিদ্ররা ধনীদেরকে সুদ দেয় না; বরং ধনীদের থেকে সুদ আদায় করে। এতে দরিদ্রদের উপকার।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো, কুরআনে রিবার বিরুদ্ধে আলোচনা এক জায়গায় নয় বিভিন্ন সূরার আট নয় জায়গায় এসেছে এবং চল্লিশের চেয়ে বেশি হাদীসে বিভিন্ন শিরোনামে রিবার অবৈধতা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব উদ্ধৃতির কোন একটি জায়গাতেও এটা বলা হয়নি যে, এ অবৈধতা শুধু ঐ রিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য লেনদেন করা হয়। ব্যবসায়ী সুদ এ বিধানের আওতামুক্ত। এত সুস্পষ্ট বিধানের ক্ষেত্রে এ অধিকার কে তাকে দিল যে, আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট নির্দেশকে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে বিকৃত করে দেবে। কোন একটা বিধানকে শর্তযুক্ত করতে হলে তার জন্য স্পষ্ট দলিল প্রমাণের প্রয়োজন। কোন প্রমাণ ছাড়া সাধারণ আইনকে শর্তমুক্ত করার কোন অবকাশ নেই। এটা কুরআন বিকৃতির শামিল। আল্লাহ না করুন, এ দরজা যদি খুলে দেয়া হয়, তাহলে কেউ বলে উঠবে- আধুনিক যুগের আধুনিক মদ হারাম নয়। প্রাচীন আরবে প্রচলিত মদই অবৈধ ছিল।

কারণ সেগুলো অপরিচ্ছন্ন পাত্রে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পচিয়ে বানানো হতো। এখন তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। মেশিনের মাধ্যমে এসব তৈরি করা হয়। সুতরাং এ মদ ঐ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তেমনি জুয়ার ব্যাপারটিও। তৎকালীন আরবে যে ধরনের জুয়াবাজি প্রচলিত ছিল আল কুরআন যেটাকে 'মাইসির' এবং 'আসলাম' আখ্যায়িত করে হারাম ঘোষণা দেয়, আজ ঐ জুয়ার অস্তিত্বই নেই। আজ তো লটারীর মাধ্যমে বড় বড় ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে।

এসব ঐ যুগের জুয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানেই শেষ নয়। ব্যভিচার, বেলেল্লাপনা, চুরি, ডাকাতি সব কিছুই প্রাচীন ধারা থেকে পরিবর্তিত ধারাই আমরা দেখতে পাই। তবে তো সবকিছুকেই বৈধ বলতে হবে। আর এটাই যদি মুসলমানী হয় তাহলে ইসলামের তো আর কিছুই থাকবে না। যখন শুধু আকার আকৃতির পরিবর্তনের কারণে কারও সত্তাগত পরিবর্তন হয় না, তাহলে যে মদ মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় তার আকৃতি যাই হোক এবং তা যেভাবেই বানানো হোক, সব সময়ই তা হারাম হবে। জুয়া এবং বাজি চাই তা প্রচলিত চোখ ধাঁধানো আকৃতিতে হোক বা লটারীর মত অন্য কোন

পন্থায় হোক, সর্বাবস্থায়ই তা অবৈধ। বেহায়াপনা, নগ্নতা এবং ব্যভিচার প্রাচীন পদ্ধতিতে হোক আর আধুনিককালের ক্লাব, হোটেল, সিনামার আকারে হোক– সর্বাবস্থায় তা অবৈধ। ঠিক তেমনি রিবা বা সুদ, চাই তা প্রাচীন আমলের মহাজনী সুদ হোক বা আধুনিককালের ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকিং সুদ হোক সর্বাবস্থায়ই তা হারাম এবং অবৈধ।

কুরআন নাযিলের সময় আরবে ব্যবসায়ী সুদ প্রচলিত ছিল

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যদি রিবাকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, এ ধারণাও ভুল যে, কুরআন নাযিলের সময় শুধু ব্যক্তিগত ঋণ সংক্রান্ত সুদ প্রচলিত ছিল। ব্যবসার জন্য সুদের বিনিময়ে টাকা নেয়ার কোন প্রচলন ছিল না। বরং রিবার আয়াতের শানে নুযূল দেখলে বুঝা যায় যে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে তা ব্যবসায়ী সুদ সংক্রান্ত ছিল।

আরবরা বিশেষ করে কুরাইশরা অধিকাংশই ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আর ব্যবসায়ী প্রয়োজনে সাধারণত তারা সুদী লেনদেন করতো। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'উমদাতুল কারী'তে–

وَذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا

এ আয়াতাংশের শানে নুযূল সম্পর্কে যায়েদ ইবনে আরকাম, ইবনে জুরায়জ, মাকাতিল ইবনে হিব্বান থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়।

জাহিলী যুগ থেকে বনু সাকিফ গোত্রের আমর ইবনে উমায়ের বংশের সাথে বনু মাখযুম গোত্রের বনু মুগীরা বংশের সুদী লেনদেন চলে আসছিল। পরে বনু মুগীরা বংশের লোকেরা মুসলমান হয়ে যায়। আর নয় হিজরীতে তায়েফের অধিবাসী সাকিফ গোত্রের লোকেরাও মদীনায় এসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। [হেদায়া নেহায়া] মুসলমান হয়ে সবাই সুদী ব্যবসা ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার করে এবং তাওবা করে। কিন্তু পুরোনো সুদী কারবারের বড় অংকের একটা লেনদেন বনু সাকিফ ও বনু মুগীরার মধ্যে বাকী ছিল। বনু মুগীরা বড় অংকের সুদী

টাকা বনু সাকিফকে দেয়ার কথা ছিল। সে হিসেবে বনু সাকিফ তাদের প্রাপ্য আদায়ের জন্য চাপ দিল। বনু মুগিরা বললো, আমরা এখন মুসলমান হয়ে গিয়েছি। ইসলামে সুদী লেনদেন হারাম। সুতরাং আমরা এখন আর সুদ আদায় করবো না।

ঘটনাটি ঘটে মক্কায়। পরে বিষয়টি ইতাব ইবনে উসাইদ (রা.)-এর আদালতে পেশ করা হয়। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতাব ইবনে উসাইদ (রা.)কে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)কে তাঁর সাথে কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দেয়ার জন্য নিয়োজিত করেন। সুদের পুরোনো লেনদেনের ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্ট কিছু ছিল না বিধায় হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) ব্যাপারটি লিখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পাঠান। চিঠিটি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পৌছলো, তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এর ফয়সালা সম্বলিত সূরা বাকারার দুটো আয়াত–

وَذَرُوْامَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا

নাযিল হয়। এর সারমর্ম হলো– রিবাকে হারাম ঘোষণাকারী আয়াত নাযিল হওয়ার আগে থেকে যে সুদী লেনদেন চলে আসছে এবং এখনও চলছে, এ লেনদেন এখন থেকে অবৈধ। এখন শুধু মূলধন লেনদেন করা যাবে। এ অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইতাব ইবনে উসাইদ (রা.)-এর কাছে জবাব লিখে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন– এখন থেকে কোন ধরনের সুদ লেনদেন করা সম্পূর্ণ অবৈধ। কুরআনে কারীমের আয়াত শুনে সবাই এক সাথে তাওবা করে এ ধরনের লেনদেন রহিত করে দেন। [উমদাতুল কারী : ১১ : ২০১]

ঘটনাটি তাফসীরে বাহরে মুহীত এবং তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে সামান্য হেরফেরসহ বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরে ইবনে জরীর ও হযরত ইকরামা (রা.)-এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর আলা বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এদিকে ইমাম বাগাভী (রহ.) আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস ও খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর শেয়ারে ব্যবসা ছিল। তায়েফের বনু সাকিফের সাথে তাদের লেনদেন ছিল। হযরত আব্বাস (রা.)-এর কাছে বনু সাকিফের মোটা অংকের সুদী দেনা ছিল। হযরত আব্বাস (রা.) বনু সাকিফের কাছে ঐ দেনা পরিশোধ করার তাগাদা দিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের বিধান মোতাবেক তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)কে তার পাওনা সুদ মওকুফ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। [তাফসীরে মাযহারী]

পরে দশম হিজরীতে মিনায় বিদায় হজের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেন এভাবে–

اَلَا كُلُّ شَيْئٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِىْ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاِنَّ اَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ ابْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاَوَّلُ رِبًا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ۔

অর্থাৎ জেনে রাখ! মূর্খতার যুগের সব কুসংস্কার আমার পায়ের নীচে পিষে দেয়া হলো। সে যুগের হত্যার প্রতিশোধ প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দেয়া হলো। প্রথমেই আমরা আমাদের আত্মীয় রবীয়া ইবনে হারিসের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত হলাম। যাকে বনী সা'দ গোত্রে দুধ পান করার জন্য দেয়া হয়েছিল। তাকে হুযাইল হত্যা করেছিল। তেমনি জাহিলী যুগের সব সুদী লেনদেন বন্ধ করে দেয়া হলো। এ ক্ষেত্রে আমার চাচা আব্বাস (রা.)-এর প্রাপ্য সুদ মওকুফ করে দেয়া হয়েছে। [হযরত জাবের (রা.)-এর বর্ণনায়– মুসলিম]

বিদায় হজের এ ঐতিহাসিক ভাষণ ইসলামের তাৎপর্যপূর্ণ এক অধ্যায়। এ ভাষণে জাহিলী যুগ থেকে পর্যায়ক্রমে চলে আসা হত্যার প্রতিশোধ

স্পৃহাকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়। তেমনি পুরোনো সব সুদী লেনদেনকে রহিত করে দেয়া হয়। অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে ঘোষণা দেয়া হয় যে, প্রথমেই আমরা আমাদের বংশীয় দাবী ছেড়ে দিচ্ছি। যা অন্য বংশের লোকেরাও অনুসরণ করবে। তারা যেন এটা না ভাবে যে, আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়া হচ্ছে।

ইমাম বগভী (রহ.) হযরত ইকরামা (রা.)-এর তৃতীয় আরেকটি ঘটনা সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্বাস ও হযরত উসমান (রা.) এক ব্যবসায়ীর কাছে সুদের টাকা পাওনা ছিলেন। ঐ টাকা চাওয়া হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরের আয়াত অনুসারে সুদের টাকা মওকুফ করে দেয়ার নির্দেশ দেন।

সুদ সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে যে তিনটি ঘটনা নির্ভরযোগ্য তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে, তার প্রথম ঘটনাতে বনু সাকিফ গোত্র বনু মুগীরার কুরাইশী এক লোকের কাছে সুদী অর্থ পাওনা ছিল। দ্বিতীয় ঘটনায় এর বিপরীত বনু সাকিফের সুদ কুরাইশ পাওনাদার ছিল। তৃতীয় ঘটনায় কোন বংশ নির্ধারণ ছাড়া একদল ব্যবসায়ীর সুদ অন্য একদল ব্যবসায়ী পাওনাদার ছিল। সবগুলো ঘটনা মৌলিকভাবে একই। মৌলিক কোন বৈপরীত্য নেই। বোঝা যায়, সবগুলোর ব্যাপারেই কুরআনের বিধান নাযিল হয়েছে। তাফসীরে দুররে মানসুরের একটি হাদীসও এটা প্রমাণ করে, যেখানে কোন নির্ধারিত ঘটনাকে উপলক্ষ না বানিয়ে বনু সাকিফের এক বংশ বনু উমর এবং কুরাইশের এক বংশ বনু মুগীরা উভয়ের মাঝে সুদী লেনদেন চলে আসছিল। [আবু নঈম সূত্রে দুররে মানসুর : ১ : ৩৬৬]

এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা পরস্পর পরস্পর থেকে সুদী ঋণ নিতো।

এখানে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এরা যে সুদী ঋণ নিতো তা কোন বিপদে পড়ে অভাবের তাড়নায় নিতো না। বরং ব্যবসায়ী প্রয়োজনের তাগাদায় এসব ঋণ নিতো এবং সুদ প্রদান করতো। এর প্রমাণস্বরূপ নীচে কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করা হলো–

এক.

كَانَ بَنُو الْمُغِيْرَةَ يَرْبُوْنَ لِثَقِيْفَ

অর্থাৎ বনু মুগীরা সাকিফকে সুদ দিত। [দুররে মানসুর]

দুই.

كَانَ رِبًا يَتَبَايَعُوْنَ بِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ

অর্থাৎ এটা ছিল রিবা। জাহিলী যুগের লোকেরা যার মাধ্যমে ব্যবসা করতো। [দুররে মানসুর]

তিন.

نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٍ مِّنْ بَنِى الْمُغِيْرَةَ كَانَا شَرِيْكَيْنِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُسْلِفَانِ فِى الرِّبَا اِلٰى نَاسٍ مِّنْ ثَقِيْفٍ-

অর্থাৎ আয়াতটি হযরত আব্বাস (রা.) এবং বনু মুগীরার একজন লোকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। উভয়ের শেয়ারে ব্যবসা ছিল। এরা সাকিফের কিছু লোককে সুদের ভিত্তিতে আর্থিক ঋণ প্রদান করতো। [দুররে মানসুর : ১ : ৩৬৬]

তাফসীরে কুরতুবীতে فَلَهٗ مَا سَلَفَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

هٰذَا حُكْمٌ مِّنَ اللّٰهِ لِمَنْ اَسْلَمَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وَثَقِيْفٍ وَمَنْ كَانَ يَتَّجِرُ هُنَالِكَ-

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ তাদের জন্য যারা কুরাইশ ও সাকিফের ব্যবসায়ী ছিল এবং কুফুরী ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। [কুরতুবী : ৩ : ৩৬১]

এসব বর্ণনা প্রমাণ করছে যে, তারা যে সুদী লেনদেন করতো, ঋণ নিতো এবং এর বিনিময়ে সুদ দিতো, এটা শুধু ব্যক্তিগত অভাব অনটনের জন্য

নয়; বরং ব্যবসায়ী উন্নতির আশায়ই তারা এটা করতো। যেভাবে এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ী থেকে বা এক কোম্পানী অন্য কোম্পানী থেকে সুদের বিনিময়ে ঋণ নিয়ে থাকে। তাছাড়া তারা ঋণের বিনিময়ে সুদ নেয়াকে এক ধরনের ব্যবসাই মনে করতো। এজন্যই তারা বলতো—

اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا

তাদের এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে কুরআন ঘোষণা করেছে—

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا-

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করে দিয়েছেন।

এর মাধ্যমে ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আজো যারা ঋণের সুদ এবং ব্যবসায়ী সুদের মধ্যে পার্থক্য করে ব্যবসায়ী সুদকে ব্যবসার মতো বৈধ বলতে চান, তাদের উক্তি ঐ জাহিলী যুগের মূর্খদের উক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল মনে হয়। যারা বলেছিল—

اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا

নিশ্চয়ই রিবা তো ব্যবসার মতই।

এবং যে কারণে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিও নেমে এসেছিল। (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। তায়েফের বনু সাকিফ গোত্র খুব ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিল। সুদী কারবারে তাদের প্রচুর নামদাম ছিল। তাফসীরে বাহরে মুহিতে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে—

كَانَتْ ثَقِيْفُ اَكْثَرُ الْعَرَبِ رِبٰوًا

অর্থাৎ বনু সাকিফ গোত্র পুরো আরবের মধ্যে সুদী লেনদেনে শীর্ষে ছিল।

এসব তথ্য ও আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো—

১. বনু সাকিফ গোত্র ধনী ব্যবসায়ী ছিল। সুদী লেনদেনে প্রসিদ্ধ এক গোত্র

ছিল। বনু মুগীরার কাছে সুদী পাওনা ছিল। সে বনু মুগীরাও ধনী ব্যবসায়ী ছিল।

২. হযরত আব্বাস ও খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর ব্যবসা ছিল। বনু সাকিফের মত ধনী ব্যবসায়ীরাও তাদের কাছ থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতো।

৩. হযরত আব্বাস এবং হযরত উসমান (রা.) অন্য এক ব্যবসায়ীর সাথে সুদী কারবার করতেন।

আরও একটি ঘটনা হযরত বারা ইবনে আযিব এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে জামে'-এ-আবদুর রাজ্জাকের সূত্রে কানযুল উম্মালে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيْئَةً۔

তারা বলেন– আমরা উভয়ে ব্যবসায়ী ছিলাম। এক ব্যাপারে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম। নগদ নগদ হলে জায়েয। এ ক্ষেত্রে বাকী লেনদেন অবৈধ।

৪. রিবার আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে যত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার অধিকাংশের অবস্থা এমন যে ব্যক্তি ব্যক্তির থেকে ঋণ নিতো না; বরং এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠী থেকে ঋণ নিতো। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, প্রত্যেক গোষ্ঠীর ব্যবসায় অনেক সদস্য অংশীদার হতো। যেন আরব ব্যবসায়ীদের একেকটা গোষ্ঠী একেকটা কোম্পানী ছিল। এর সত্যতা প্রমাণের জন্য বদরের যুদ্ধের ব্যবসায়ী কাফেলার ঘটনা সম্বলিত নির্ভরযোগ্য হাদীসই যথেষ্ট। তাফসীরে মাযহারীতে ইবনে উকবা ও ইবনে আমিরের বর্ণনায় এসেছে–

فِيْهَا اَمْوَالٌ عِظَامٌ وَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ قُرَشِىٌّ وَلَا قُرَشِيَّةٌ لَهُ مِثْقَالٌ فَصَاعِدًا اِلَّا بُعِثَ بِهِ فِى الْعِيْرِ فَيُقَالُ اِنَّ فِيْهَا خَمْسِيْنَ اَلْفَ دِيْنَارٍ۔

অর্থাৎ ঐ কাফেলায় অনেক পণ্য ছিল। মক্কার কুরাইশী কোন পুরুষ বা নারী বাকী ছিল না যে, ঐ ব্যবসায় অংশীদার ছিল না যার কাছেই সামান্যতম স্বর্ণ ছিল সেই ব্যবসায় শরীক হয়ে গিয়েছে। ঐ কাফেলার মূলধন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মূলধন ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার। (প্রায় ৫২ লাখ টাকা)।

এসব ঘটনাবলী এবং আস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমরা যদি নিরীক্ষণ করতে চেষ্টা করি যে, কারা কার থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিচ্ছে? দেখা যাবে– এক গোত্র অন্য গোত্র থেকে অর্থাৎ এক কোম্পানী অন্য কোম্পানী থেকে সুদের উপর ঋণ নিচ্ছে। তাহলে এখানে কি এটা ধরে নেয়া যাবে যে, তারা ব্যক্তিগত দুরাবস্থা বা অভাব-অনটনের কারণে বিপদগ্রস্ত হয়ে ঋণ নিতো? বরং এখানে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের এ ঋণ নেয়া এবং সুদ দেয়া ব্যবসায়ী প্রয়োজনে সম্পন্ন হতো। এমনকি সামনে সুদ সম্পর্কিত কিছু হাদীস আসবে। সেখানে ৪৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে প্রশ্ন করল যে, আমরা কি ব্যবসায় কোন ইহুদী খৃষ্টানের সাথে শেয়ার হতে পারবো? জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন–

لَا تُشَارِكْ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا لِاَنَّهُمْ يُرْبُوْنَ وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ

অর্থাৎ কোন ইহুদী খৃষ্টানের সাথে শেয়ারে ব্যবসা করো না। কেননা তারা সুদী কারবার করে। আর সুদ সম্পূর্ণ অবৈধ।

হাদীসটিতে বিশেষভাবে ব্যবসায়ী সুদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে। জবাবে সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

এখন রইলো ব্যাংকের সুদী লেনদেনের ব্যাপার। এতে তো দরিদ্র লোকদের উপকার হয়। তারা কিছু পেয়ে যায়। এটা একটা ভীষণ ধোকা। যা ইহুদী খৃষ্টানদের তত্ত্বাবধানে এই অভিশপ্ত লেনদেনটি একটা চিত্তাকর্ষক

আকৃতি ধারণ করে ফেলেছে। সুদের কয়েক পয়সার লিপ্সা সংবরণ করতে না পেরে দরিদ্র বা অল্প পুঁজিওয়ালারা নিজেদের পুঁজি ব্যাংকে নিয়ে জমা করে দেয়। এভাবে পুরো জাতির সম্পদ ব্যাংকে এসে জড়ো হয়ে যায়।

সবাই জানে, ব্যাংক কোন দরিদ্রকে টাকা দেয়া তো দূরের কথা তারা ব্যাংকের দরজায়ই পা রাখতে পারে না। ব্যাংকাররা বিশাল পুঁজিওয়ালাদেরকে ঋণ দিয়ে তাদের থেকে বড় অংকের সুদ আদায় করে। ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে, জাতির পুরো সম্পদ মুষ্টিমেয় কতক বড় পেটওয়ালাদের লোকমায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। যে দশ হাজার টাকার মালিক, সে দশ লাখ টাকার ব্যবসা করতে শুরু করে। এ থেকে সে যে বিশাল সম্পদের মালিক হলো, তা থেকে কয়েক পয়সা ব্যাংককে সুদ দিয়ে বাকী সব সম্পদের মালিক বনে বসে গেল। ব্যাংকাররা ঐ কয়েক পয়সা হিসেব করে তা থেকে কিছু পুরো জাতিকে বণ্টন করে দিল। (ব্যস, পুঁজিবাদ জিন্দাবাদ)।

এটা জাদুর কাঠি। আলাদিনের চেরাগ। পুঁজিপতিরা খুশি, আমরা তো বিশাল সম্পদের মালিক বনে গেলাম। মূলধন ছিল মাত্র দশ হাজার। লাভ কামালাম দশ লাখ। ধোকার শিকার বেচারা গরীব। তার সান্ত্বনা, আরে যাই হোক কিছু তো পাওয়া গেল। ঘরে পড়ে থাকলে তাও তো আসতো না। নাই মামুর চেয়ে তো কানা মামুও ভালো।

কিন্তু! যদি সুদের এ অভিশপ্ত চক্রের ব্যাপারে কোন বুদ্ধিমান লোক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে গবেষণা করে তাহলে দেখবে যে, আমাদের এসব ব্যাংক ব্লাড ব্যাংক হয়ে আছে। যেখানে পুরো জাতির রক্ত জমা হয়। আর সেগুলো মুষ্টিমেয় কতেক পুঁজিপতির রগে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। গোটা জাতি দারিদ্রতার শিকার হয়ে যায় এবং হাতেগোনা কতেক মোড়ল জাতির সম্পদের দখল নিয়ে নেয়। যখন কোন এক ব্যবসায়ী দশ হাজারের মালিক হয়ে দশ লাখের বেড়া পার করে, চিন্তা করুন! এমন ব্যবসায়ীরা যদি লাভবান হয় তবে সুদের কয়েক পয়সা ছাড়া পুরো টাকার সেই মালিক হয়ে যায়। আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ব্যবসায় মার খায়, তখন তার মাত্র দশ হাজার গেল, বাকী লাখ লাখ টাকা গোটা জাতির নষ্ট হলো। এর কোন ক্ষতিপূরণ হয় না।

শোষণের আরও পদ্ধতি দেখুন! ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য আরও অনেক দরজা খুলে রাখে। ব্যবসায় ক্ষতি যদি কোন দুর্যোগের কারণে হয়ে থাকে, যেমন- পণ্যে বা জাহাজে আগুন লেগে তার সবকিছু পুড়ে গিয়েছে। তখন সে তো ইনস্যুরেন্স কোম্পানী থেকে তার ক্ষতিপূরণ উসুল করে নেয়। তার ক্ষতি পুষে যায়। কেউ যদি চিন্তা করতো যে, ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর এ টাকাটা কোথা থেকে এলো? এ টাকাও তো গরীব লোকদের রাখা জমা টাকা। যাদের না জাহাজ পুড়ে, না কোন গাড়ী এক্সিডেন্ট হয়। এ সবের তো গরীব বেচারা স্বপ্নও দেখেনি। ফলে দুর্যোগের কোন ফায়দা গরীবরা ভোগ করতে পারে না। এখানেও তারা ঐ দুই তিন আনা সুদ পেয়েই সর্বস্বান্ত। আর দুর্যোগের শতভাগ উপকার ভোগ করে জাতির ঐসব ঠিকাদারেরা। ব্যবসায়ী ক্ষতির আরেকটা দিক হলো, অনেক সময় পণ্যের বাজার দর নীচে নেমে যায়। এর থেকে বাঁচার জন্যও তারা তাদের পথ খোলা রেখেছে। যখনই দেখে যে, দর নীচে নেমে যাওয়ার আলামত দেখা যাচ্ছে তখনই তা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। ক্ষতির বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে বেঁচে যায়। এর ভেতর একটা মারাত্মক ক্ষতি হলো, অল্প পুঁজির ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় টিকে থাকতে পারে না। কেননা, বড় ব্যবসায়ীরা বাজারে প্রতিযোগিতা (Compitition) তৈরি করে। বড় ব্যবসায়ীরা যখন কম্পিটিশনে নামে তখন এক দিনেই ছোট ব্যবসায়ীরা দেউলিয়া হয়ে যায়। ফলে যে ব্যবসা গোটা জাতির জন্য উন্নতির সোপান হওয়ার কথা তা জাতির অনেককে দেউলিয়া বানিয়ে বিশেষ কতক পুঁজিপতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির সামাজিক একটা বিরাট ক্ষতি হলো, একে তো মুষ্ঠিমেয় কতক পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের সম্রাট সেজে বসে যায়। তারপর আবার এদের হাতে এমন অসুরীয় ক্ষমতা চলে আসে যে, তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বাজার চালাতে পারে। নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পণ্যের দাম তারা যা নির্ধারণ করবে তাই হবে। সোজা কথায়, এসব হুজুর(!)দের রহম আর করমের উপর বাজার দর নির্ভর করে। এই গুটিকতেক আঁতেলের প্রভাবে আন্তর্জাতিক মুক্ত বাণিজ্যের এ যুগে দেশে দেশে জীবন-জীবিকার উপকরণ পণ্যসামগ্রীর দাম দিন দিন বেড়ে চলেছে। এ যেন লাগামহীন ঘোড়ার অপ্রতিরোধ্য গতি। সবগুলো সরকারই বাজার

দর নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছে। এখন চিন্তা করুন, ধোকায় পড়ে থাকা সাধারণ লোক যে তার রক্ত পানি করা টাকা ব্যাংকে বা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে রেখে সুদের নামে এক দুই আনা পেয়েছিল আর আনন্দ চিত্তে ঘরে ফিরেছিল, তা নিয়ে বাজারে গিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ বা তিনগুণ উপরে উঠে গিয়েছে। তখন অনুন্যোপায় হয়ে চড়া মূল্যে তার প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে নেয়। এ যেন দুই আনা সুদ তাকে দিল এবং তার কাছ থেকে নিল ছয় আনা। এই ছয় আনা কোথায় গেল? ঐ দশ হাজার দিয়ে দশ লাখ কামাই করা লোকটির পকেটে। যে তার লভ্যাংশ থেকে দুই আনা সুদের অংশ দিয়েছিল। বাজার দরের লাগাম টেনে আবার সে দুই আনার বিনিময়ে ছয় আনা আদায় করে নিল। কী আশ্চর্য শোষণ! আশ্চর্য পুঁজিবাদের এ সুদী তেলেসমাত।

জাতি তাদের আত্মা উৎসর্গ করতে উৎসাহিত হোক ঐ মহাগ্রন্থ কুরআনের প্রতি, যে কুরআন মজীদ ধোকাবাজদের এ ধোকার জট খুলে দিয়েছে মাত্র দুটো বাক্য দিয়ে। বিজ্ঞানময় এ কুরআনে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا-

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।

এখানে সুদের অবৈধতা প্রকাশ করার আগে ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, নিজের ধন-সম্পদ এবং পরিশ্রম ব্যবসায় খাটিয়ে লাভবান হওয়া এটা কোন অপরাধ নয়। অপরাধ হলো অন্য অংশীদারের প্রতি জুলুম করা। তাদেরকে তাদের অধিকার নিশ্চিত না করা। মূলধন অন্যের এবং শ্রম নিজের। ব্যবসার এ দুটো ধারা রয়েছে। যার মাধ্যমে সে তার জীবিকার ব্যবস্থা করে। ব্যবসায় উন্নতি হয়। এর অর্থ এই নয় যে, মূলধনের মালিককে এক দুই পয়সা লাভ দিয়ে বাকী পুরো সম্পদের সে মালিক বনে যাবে। গভীর চিন্তা করলে বুঝে আসবে, ব্যবসা আর সুদের মধ্যে পার্থক্য শুধু লভ্যাংশই নির্ণয় করে। ন্যায়সঙ্গত বন্টনকে ব্যবসা বলে। আর যে বন্টনে জুলুম করা হয়, ঠকানো হয় তাকেই বলে সুদ বা রিবা। পুরো ব্যবসার লভ্যাংশকে মূলধনের মালিক এবং শ্রমদাতার

মধ্যে ন্যায়সম্মত বন্টন করে দাও, অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ মূলধনের মালিককে দিয়ে বাকীটুকু শ্রমদাতা নিয়ে নিক। এর বিপরীত হলে সেটা হবে ব্যবসা। ইসলামে এ প্রক্রিয়া শুধু বৈধই নয়, বরং জীবিকা অন্বেষণের সর্বোত্তম পথ। হ্যাঁ, যদি এ ব্যবসার অন্য অংশীদার অর্থাৎ বিনিয়োগকারী মূলধনের মালিকের প্রতি জুলুম চালাতে শুরু করে তার জন্য ন্যূনতম একটা অংশ নির্ধারণ করে দেয় এবং বাকী পুরোটুকু শ্রমদাতা নিজের জন্যে রেখে দেয় তাহলে এটা জুলুম। এটা ব্যবসা নয়; বরং ঋণের বিনিময় নামে অভিহিত হবে। আর এর নামই কুরআনুল কারীম রেখেছে– 'রিবা' বা সুদ।

যদি বলা যায় যে, এ অবস্থায় বিনিয়োগকারীর একটু হলেও তো লাভ আসছে। ব্যবসার লাভ-লোকসানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় যতই লোকসান দিক না কেন, বিনিয়োগকারী তার নির্ধারিত অংশ পেয়ে যাবে। যদি সে ব্যবসায় শেয়ার হয় তাহলে তো তাকে লোকসানেরও অংশীদার হতে হবে। এটা তো বিনিয়োগকারীর জন্যে ঝামেলামুক্ত লাভবান হওয়ার উত্তম পন্থা। এর জবাব সুস্পষ্ট। তখন শ্রমদাতার উপর জুলুম হয়ে যায়। কেননা, তার ব্যবসায় লোকসান হয়েছে। মূলধনও গেল এবং বিনিয়োগকারী শুধু মূলধন ফেরত দিয়ে পার পাবে না, সাথে সাথে নির্ধারিত লভ্যাংশও তার ঘাড়ে চাপবে।

আল কুরআন উভয় পক্ষের প্রতি ন্যায় প্রদর্শন করতে চায়। লাভ হলে উভয়ের হবে, লোকসান হলেও উভয়ে তা বন্টন করবে। মোটকথা, লাভ হলে তা ইনসাফের সাথে বন্টন করতে হবে। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী দেউলিয়া নিয়ম-কানুন এমন যে, ব্যবসায়ী যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এর বোঝা সাধারণ মানুষকেও বহন করতে হয়। সুদী ব্যবসারীতির ব্যাপারে একটু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে যে, সুদী অর্থনীতির অবিশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো নিরীহ সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যতা এবং মুষ্টিমেয় কতক পুঁজিপতির ব্যবসায় সীমাহীন প্রবৃদ্ধি। রাতারাতি লাল। এ অর্থনৈতিক জুলুম এবং শোষণ গোটা জাতির জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়ে আছে। এজন্যই ইসলাম এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

সুদ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের ঘোষণা

আয়াত নং- ১

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا م وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥

অর্থাৎ আর ঐসব লোক যারা সুদ খায়, কিয়ামতের দিন তারা কবর থেকে উত্থিত হবে এমন লোক হয়ে যাকে শয়তান তার স্পর্শের মাধ্যমে উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা বলে বেচাকেনা তো সুদের মতো। অথচ আল্লাহ তাআলা বেচাকেনাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে আগে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা আবার শুরু করবে, তারাই আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। [বাকারা : ২৭৫]

এ আয়াতের প্রথমে আল্লাহ তাআলা সুদখোরদের ভীষণ পরিণতি এবং কিয়ামতের দিন তার অপমানজনক অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন– সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠবে যেন সে বেহুশ। শয়তানের কুমন্ত্রণায় উদ্ভ্রান্ত এবং উন্মাদপ্রায়। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, লোকেরা কিয়ামতের দিন এদের পাগলামী দেখে পরিচয় করতে পারবে যে, এরা সুদখোর। কিয়ামতের দিনের ঐ বিশাল জনমণ্ডলীর সামনে সে অপমানিত হবে। কুরআন এখানে 'পাগল' শব্দ ব্যবহার না করে 'শয়তানের মন্ত্রণায় উদ্ভ্রান্ত' শব্দ ব্যবহার করে। এটা হয়তো এজন্য করা

হয়েছে, পাগল তো কিছুই বুঝতে পারে না। পুরস্কারের খুশি এবং শাস্তির যন্ত্রণা কোনটাই তাকে প্রভাবিত করবে না। সে তো অনুভূতিহীন। এরা এ রকম পাগল হবে না। বরং শাস্তির যন্ত্রণা অনুভব করবে। পাগল তো অনেক সময় চুপচাপ একদিকে পড়ে থাকে। এরা এমন হবে না। তারা উদ্ভ্রান্তের মতো অসঙ্গত আচরণ করতে থাকবে। তাদের এ অসঙ্গত আচরণ দেখে কিয়ামতবাসী সবাই বুঝে যাবে যে, লোকটা সুদখোর ছিল। তখন সে সবার সামনে অপমানিত হবে। লাঞ্ছনা অনুভব করবে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রত্যেক কাজের প্রতিদান, চাই তা ভালো হোক বা মন্দ, যথোপযুক্ত এবং যথা পরিমাণ হওয়া উচিত। বুদ্ধি এবং যুক্তিও তাই বলে। মহান আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞাময় রীতিও এ রকম। এখানে সুদ খাওয়ার এক সাজা দেয়া হয়েছে এভাবে যে, তাকে মস্তিষ্কবিকৃত করে পুনরুত্থিত করা হবে। শাস্তির ধরনের সাথে সুদের কী সম্পর্ক?

তাফসীর বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলেন– সুদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, সুদখোর সম্পদের লিপ্সায় এমন মোহগ্রস্ত হয় এবং এর মহব্বতে এমনভাবে মজে যায় যে, শুধু সম্পদ জমা করার আর বাড়ানোর ফিকিরেই প্রতিটি মুহূর্ত ডুবে থাকে। শরীরের যত্ন নেয়ার চিন্তা, বিশ্রামের প্রয়োজন, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ-খবর তো দূরের কথা, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যতা তার প্রশান্তির কারণ হয়ে যায়। যে ব্যাপারে পুরো জাতি কাঁদে, তাতে সে আনন্দ পায়। এটা এক ধরনের বেহুশী, এক ধরনের উন্মাদনা। যা সে দুনিয়াতেই নিজের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছিল। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাকে তার নিজস্ব আকার ও আকৃতিতে পুনরুত্থিত করবেন।

আল কুরআনের আয়াতে সুদ খাওয়ার আলোচনা এসেছে। এ দ্বারা সাধারণ সুদ থেকে উপকৃত হওয়া উদ্দেশ্য। চাই তা খাওয়ার আকারে হোক, পান করার আকারে হোক বা যে কোনভাবে ব্যবহারের আকারে হোক। এখানে খাওয়া শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পরিভাষায় এমনই ব্যবহৃত হয়। তাই এই খাওয়া শব্দটি ব্যবহারের আরেকটি কারণ আছে। খাওয়া ছাড়া আর যত ব্যবহারের অবস্থা আছে, তাতে এ সম্ভাবনা থাকে যে, ব্যবহারকারী

সাবধান হয়ে নিজের ত্রুটি থেকে ফিরে আসবে। কোন জিনিস পরিধান করছি, সেটাকে তার প্রকৃত প্রাপকের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে পারবে। অন্য ব্যবহারের জিনিস ব্যবহার করার পর তার প্রকৃত হকদারের হাতে পৌঁছে দিতে পারবে। কিন্তু পানাহারের ব্যাপারটি এমন যে তা খেয়ে ফেললে বা পান করে নিলে, ফিরে এসে প্রকৃত পাওনাদারের হাতে পৌঁছে দেয়ার আর সম্ভাবনা থাকে না। এ দিক থেকে এটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার।

আয়াতের পরবর্তী অংশে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অপরিণামদর্শী এসব লোক একটি অপরাধ করেছে যে, আল্লাহ তাআলা যে সুদকে অবৈধ ঘোষণা দিয়েছেন, তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে। আরেকটি অপরাধ হলো, অপরাধকে অপরাধ মনে না করে, অপরাধকে বৈধতা দেয়ার অপচেষ্টা। যেমন- তারা বলেছিল, ব্যবসা এবং সুদের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যবসায় যেমন একটি পণ্যের বিনিময় করা হয় অন্য পণ্যের মাধ্যমে এবং সাথে লাভও নেয়া হয়। ঋণের বিনিময়ে লাভ নেয়াটাও তো তেমনি। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি একটু চিন্তা করে তাহলে এ দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখতে পাবে। কেননা ব্যবসায় উভয় পক্ষের বিনিময়কৃত জিনিস সম্পদ হয়ে থাকে। এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য সম্পদ নেয়া হয়। কিন্তু ঋণের উপর বাড়তি যে অংশ নেয়া হয় তার সম্পূর্ণ বিনিময়হীন। সেখানে একটা ব্যাপার থাকে, সেটা হলো সময়। বলা হয় যে, ঋণ নিয়ে এতদিন রেখে পরিশোধ করলে এত টাকা লাভ দিতে হবে। সময় তার চেয়ে বেশি হলে লাভও বেশি দিতে হবে। সময়– এটা সম্পদ নয়। সুতরাং লাভটাকে সময়ের বিনিময় ঘোষণা দেয়া অবান্তর। মোট কথা, তারা একটি অপরাধকে দুটো ভীষণ অপরাধে পরিণত করে নিয়েছিল। একটা হলো, আইন অমান্য করা, অপরটি হলো আইনটিকেই ভ্রান্ত বলে আখ্যা দেয়া। আয়াতে তাদের যুক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে– (তারা বলছে)–

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ব্যবসাটা তো রিবার মতই।

এখানে তাদের উক্তিটা এমন হওয়া উচিত ছিল–

إِنَّمَا الرِّبٰوا مِثْلُ الْبَيْعِ

অর্থাৎ রিবা তো ব্যবসার মতই।

তারা তাদের যুক্তিমূলক বক্তব্যকে উল্টো সাজিয়ে এক ধরনের ঠাট্টা করেছে এবং বলতে চেয়েছে যে, রিবা যদি হারাম হয় তাহলে ব্যবসাও তো হারাম হওয়া উচিত। কেননা, রিবার প্রক্রিয়া যেমন ব্যবসার প্রক্রিয়াও ঠিক তেমনই।

আবু হাইয়ান তাওহীদি তাঁর তাফসীর 'বাহরে মুহীতে' বলেন– এ উক্তিটি ছিল বনু সাকিফ গোত্রের। এরা তায়েফের বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ছিল। যখন তারা এ উক্তি করে তখন তারা মুসলমান ছিল না। পরে এরা ইসলাম গ্রহণ করে।

সুদ এবং ব্যবসার মৌলিক পার্থক্য

আয়াতের তৃতীয় অংশে জাহেল লোকদের এ উক্তিকে খণ্ডন করা হয়েছে। 'সুদ আর ব্যবসা তো একই।' এটা বলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল এটা বলা যে, রিবা বা সুদও তো এক ধরনের ব্যবসা। যেমন- আজকালকার নব্য জাহেলরা বলে থাকে। যেমন- ঘরবাড়ি, দোকানপাট ভাড়া দিয়ে তার লাভ কেন নেয়া যাবে না? এটাও তো এক ধরনের ভাড়া এবং ব্যবসা। এটা এমন একটা পবিত্র তুলনা, যেমন কেউ ব্যভিচারকে এই বলে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করলো যে, এটাও তো এক ধরনের শ্রম। মানুষ হাত-পা ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রম দিয়ে চাকরি করে, বেতন নেয়। আর এটা বৈধ। তাহলে একজন নারী তার শারীরিক শ্রম দিয়ে চাকরি নিয়ে বেতন নিলে তা কেন অপরাধ হবে? এমন পাগলের প্রলাপের জবাব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে দেয়া সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকেই কলুষিত করার শামিল হবে। তাই প্রজ্ঞাময় কুরআন এর জবাবে শাহী ফরমানের ধারা অনুসরণ করেছে। সুস্পষ্ট নির্দেশ জারি করে বলেছে– এ দুটোকে এক ভাবা ভুল। আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

পার্থক্যের দিকগুলো কুরআন বর্ণনা করেনি। বর্ণনা না করার মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে। তা হলো, ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে গভীর

চিন্তা কর, গবেষণা কর; তবেই তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে 'রিবা' বা সুদ কী জিনিস, আর ব্যবসা কী জিনিস। মানুষের প্রয়োজনের পরিধি এত ব্যাপক যে, দুনিয়ার কোন একজন মানুষ চাই সে যতই বড় হোক, নিজের সব প্রয়োজন নিজে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে না এবং নিজে নিজেই মেটাতে পারে না। এজন্য মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা বিনিময়ের বিধান জারি করেছেন। আর এটাকে সমাজের প্রাকৃতিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছেন। সম্পদ এবং পরিশ্রমের পারস্পরিক বিনিময়ের উপর পুরো দুনিয়ার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এ বিনিময় প্রক্রিয়ার মধ্যে জুলুম ও শোষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন বিনিময় রীতিরও সম্ভাবনা থেকে যায় যদ্বারা মানবতা ও সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। ভেঙ্গে পড়তে পারে সামাজিক পুরো অবকাঠামো। যেমন- নারী তার শরীরকে খাটিয়ে 'যৌনকর্মী' নামে মানবতা বিধ্বংসী, ঘৃণিত এবং জঘন্য অভিশপ্ত কাজে লেগে যেতে পারে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা বিনিময় প্রক্রিয়াকে সবার জন্য মঙ্গলজনক করার উদ্দেশ্যে শরয়ী বিধান নাযিল করেন এবং এমন সব লেনদেনকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন যা কোন এক পক্ষের জন্য ক্ষতিকর বা যার ক্ষতি পুরো সমাজকে প্রভাবিত করে। ফেকাহর কিতাবে 'অবৈধ বেচাকেনা' (بَيْعٌ فَاسِدٌ) 'অবৈধ ভাড়া চুক্তি' (اِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ) 'অবৈধ অংশীদারিত্ব' (شِرْكَتٌ فَاسِدَةٌ) অধ্যায়সমূহে শত শত এমন প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে যার সবগুলো অবৈধ। যেখানেই দেখা যায় ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কোন একজনের ক্ষতি হচ্ছে এবং অন্যজন অবৈধ লাভ কামাই করছে বা যাতে গোটা জাতির জন্যে ক্ষতির আশংকা রয়েছে- তাকেই অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির ব্যাপার সবাই কিছু না কিছু ভাবে। কিন্তু সমাজের সাধারণ ক্ষতির ব্যাপারটি কেউই ভাবে না। সৃষ্টিজগতের মহান রবের বিধান প্রথমেই বিশ্ব মানবতার লাভ-ক্ষতি দেখে। তারপর দেখে ব্যক্তির লাভ-ক্ষতি। এ মূলনীতিটি বুঝে নেয়ার পর ব্যবসা ও সুদের পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন, সুদ এবং ব্যবসা বাহ্যত একই। জাহিলী যুগের লোকেরা যেমন বলেছিল- রিবা তো ব্যবসার মতই এক ধরনের ব্যবসা। কিন্তু যখন তার পরিণামের দিকে তাকাবেন তখন দেখবেন, ব্যবসায় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের লাভ যথোপযুক্ত পাওয়া যায়। এর ভিত্তি হলো পারস্পরিক সহযোগিতা। যা মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে উন্নত করে। পক্ষান্তরে

সুদ-এর ভিত্তি হলো ব্যক্তিস্বার্থের পূজা। নিজের স্বার্থ ঠিক রাখার জন্য অন্যের স্বার্থে আঘাত হানা। আপনি কারও থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা করেছেন। তাতে যদি সাধারণ নিয়মে লাভ হয়, তাহলে বছরে আপনার প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ আসবে। আপনি এ লাভ থেকে মূলধনের মালিককে ২/৩ শতাংশ সুদ হিসেবে দিয়ে বাকী পুরো লভ্যাংশের মালিক আপনি হয়ে গেলেন। এতে মূলধনের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হলো। আর যদি ব্যবসায় লোকসান হয় এবং ধরুন, মূলধন পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল। তখন এক লাখ টাকার ঋণ পরিশোধ কম বড় বোঝা নয়। তখন পুঁজির মালিক আপনার বিপদ দেখা তো দূরের কথা, সুদসহ মূল টাকা দাবী করবে। এখানে আপনি শ্রমদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। সারকথা হলো, উভয় পক্ষের জন্য নিজের স্বার্থের সামনে অন্যের ক্ষতির কোন পরোয়া না করার নামই সুদ এবং সুদী ব্যবসা। যা সহযোগিতার মূলনীতির পরিপন্থী।

মোট কথা, ব্যবসায়ী লভ্যাংশের ন্যায়ানুগ বন্টনের নাম ব্যবসা- যা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং রিবা বা সুদ স্বার্থান্ধতা, নির্দয় অনুভূতি এবং প্রবৃত্তিপূজার উপর প্রতিষ্ঠিত। তা এ দুটো স্ববিরোধী ব্যাপারকে কীভাবে একই বলে ভাবা যায়! যদি বলা হয় যে, রিবার মাধ্যমেও তো অভাবীদের প্রয়োজন মিটে। এটাও তো এক ধরনের সহযোগিতা হলো। দেখুন, এটা এমন এক সহযোগিতা যার ভেতর অভাবী ব্যক্তির ধ্বংস লুকায়িত আছে। ইসলাম তো কারও প্রয়োজন মেটানোর পর তা বলে বেড়ানোকে দান বাতিল করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ইরশাদে ইলাহী-

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى-

তোমরা দানের প্রচার করে কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে বাতিল করে দিও না।

তাছাড়া এক ব্যক্তি ব্যবসায় তার সম্পদ ব্যয় করে, পরিশ্রম ও মেধা কাজে লাগিয়ে অন্যদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে। ক্রেতা এর বিনিময় স্বরূপ ঐ পণ্যের আসল মূল্যের সাথে কিছু লাভ যোগ করে পণ্যটির মালিক হয়ে যায়। এই লেনদেনের পরে আর কোন চাওয়া পাওয়া থাকে না। কিন্তু সুদ এর বিপরীত। এটা এমন এক বাড়তি অংশ যার কোন

বিনিময় নেই। বরং ঋণ দিয়ে পরিশোধের জন্য যে সময় দেয়া হয় এটা ঐ সময়ের বিনিময়। যা ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা এ সময় বিনিময়হীন হওয়া উচিত। তাছাড়া সুদের বাড়তি অংশ একবার পরিশোধ করার পরও নিস্কৃতি পায় না। বরং প্রত্যেক মাসে বা প্রতি বছর নতুন সুদ প্রদান করতে হয়। এমনকি কখনও দেখা যায় যে, সুদের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে মূল ঋণের চাইতে বেড়ে যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সর্বত্র বিস্তৃত হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু সুদের স্বাধীন বিস্তার ঘটে না। শুধু মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির চক্রজালে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ফলে সাধারণ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যতার শিকার হয়ে মানবেতর জীবন কাটায়। তাফসীরে কুরতুবীতে (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

وَذَالِكَ اَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ رِبًا اِلَّا ذَالِكَ (اِلٰى قَوْلِهٖ) فَحَرَّمَ سُبْحَانَهٗ ذَالِكَ وَرَدَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهٖ: وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۔

অর্থাৎ আরবরা শুধু ঋণের বিনিময়ে লাভ নেয়াকে সুদ মনে করতো। আর এটাকে তারা ব্যবসার মতোই বলে ধারণা করতো। আল্লাহ তাআলা এটাকে হারাম ঘোষণা করেন। এবং তাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে সেটাকে হারাম ঘোষণা করেন। তাদের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাআলা বলেন– আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।

এ তাফসীরেই তারপর বলা হয়েছে–

وَهٰذَا الرِّبَا هُوَ الَّذِىْ نَسَخَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهٖ يَوْمَ عَرَفَةَ : اِلَّا اَنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوْعٌ۔

অর্থাৎ এটাই তো ঐ রিবা বা সুদ যাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে প্রত্যেক সুদ প্রত্যাখ্যাত বলে তা রহিত করে দেন।

আলোচ্য আয়াতের চতুর্থ অংশ হলো–

فَمَنْ

এখানে একটা প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে, যা সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানদের সামনে উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি হলো, রিবা বা সুদকে তো হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যারা সুদ হারাম হওয়ার আগে থেকে এ কারবার করে আসছে, খেয়েছে, পান করেছে, বাড়িঘর, জায়গা-জমি রেখেছে, নগদ টাকা জমিয়েছে সেগুলোও কি সব হারাম হয়ে গিয়েছে? যাদের কাছে আগেকার উপার্জন করা সম্পদ এবং স্থাবর সম্পত্তি আছে তা কি এখন ফেরত দিতে হবে? আয়াতের এ অংশে তাদের এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদ ঘোষণা করছে, সুদ হারাম সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার আগে উপার্জিত সম্পদে হারামের এ বিধান প্রযোজ্য নয়। বরং সেসব সম্পদ যার যার কাছে আছে তারা এর বৈধ মালিক হিসেবে বহাল থাকবে। কিন্তু শর্ত হলো, সামনের জন্য তাওবা করে সুদ থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় সংকল্প করে নিতে হবে এবং বেঁচে থাকতে হবে। অন্তর থেকে এর প্রতি আকর্ষণ মুছে ফেলতে হবে। অন্তরের খবর আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তাই তাওবার ব্যাপারটি ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। যেহেতু অন্তরের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাই কোন মানুষ এটা বলতে পারবে না যে, অমুক অন্তর থেকে তাওবা করেনি। আয়াতের শেষ পঞ্চমাংশে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ

অর্থাৎ যারা সুদ সম্পর্কিত কুরআনের বিধান নাযিল হওয়ার পরও সুদী লেনদেন করবে, আর স্বভাবগত বেহুদা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সুদকে বৈধ বলবে, তারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। কেননা সুস্পষ্ট হারামকে হালাল করা কুফুরী। আর কুফুরের সাজা হলো চির জাহান্নাম।

আয়াত নং- ২

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সুদকে মুছে ফেলেন এবং দান সাদকাকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা অস্বীকারকারী গুনাহগারকে ভালোবাসেন না। [সূরা বাকারা : ২৭৬]

এ আয়াতের বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহ তাআলা সুদকে মুছে দেন এবং দান-সাদকাকে বাড়িয়ে দেন। এখানে সুদের সাথে সাদকার আলোচনা এক বিশেষ সামঞ্জস্যতার জন্য করা হয়েছে। সুদ এবং সাদকা মূলত স্ববিরোধী অর্থবোধক শব্দ। ফলশ্রুতিও একে অন্যের বিরোধী। সাধারণত উভয় কাজ যারা করে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, নিয়ত এবং অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

মৌলিক স্ববিরোধিতা হলো, কোন বিনিময় ছাড়াই নিজের নিজের সম্পদ অন্যকে দিলে সাদকা হয়। আর অন্যের সম্পদ বিনিময় ছাড়া নিলে সেটা সুদ হয়। লক্ষ্য উদ্দেশ্যের স্ববিরোধিতা হলো, সাদকাকারী একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দান করে। আর সুদ গ্রহণকারী আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তার অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে তার সম্পদের বিনিময়ে অবৈধ উপার্জনের লিপ্সা করে। ফলশ্রুতির স্ববিরোধিতা হলো, আলোচ্য আয়াত থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলা সুদ হিসেবে অর্জিত সম্পদকে বা তার বরকতকে নষ্ট করে দেন। আর সাদকাকারীর সম্পদকে বা তার বরকতকে বাড়িয়ে দেন। সার কথা, সম্পদের লিপ্সাকারীর মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় না। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়কারী তার সম্পদ কমে যাওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল। ফলে তার সম্পদে বরকত হয়ে আরো বেড়ে যায়। আর অবস্থার স্ববিরোধিতা হলো, সাদকাকারীকে দীনের অন্যান্য সৎকাজেরও তাওফীক দেয়া হয় এবং সুদখোররা সাধারণ এ থেকে বঞ্চিত থাকে।

'সুদ মুছে দেয়া এবং সাদকা বাড়িয়ে দেয়া'র ব্যাখ্যা

এখানে বিষয়টি চিন্তার দাবী রাখে, সুদ মুছে দেয়া এবং সাদকা বাড়িয়ে দেয়ার ব্যাখ্যা কী? কেননা, বাহ্যত দেখা যায়, একজন সুদখোরের সম্পদে বাড়তি অংশ যোগ হয়। তখন তার সম্পদ বেড়ে যায়। আর দানকারী ব্যক্তি যখন তার সম্পদ থেকে দান করে, তখন দেখা যায় তার সম্পদ

কমে যায়। দুনিয়ার কোন হিসাব বিশেষজ্ঞ সুদী সম্পদকে যদি 'কমেছে' বলে এবং সাদকা দেয়ার পর সম্পদকে যদি 'বেড়েছে' বলে তাহলে লোকে ঐ একাউন্টেন্টকে পাগলই বলবে। কিন্তু কুরআনের এ আয়াত সুদখোরের (১০০-১০ = ৯০) নব্বই টাকার চাইতে কম ঘোষণা করেছে। তেমনি হাদীস শরীফেও ইরশাদ হয়েছে-

مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

কোন সাদকা সম্পদ থেকে কিছুই কমায় না। [মুসলিম]

এখানেও কুরআনের মত একই বক্তব্য দেখা যাচ্ছে। যা বাহ্যিক অবস্থার পরিপন্থী। এর সাদাসিধে জবাব হলো, আয়াতে সুদকে কম এবং সাদকাকৃত মালকে যে বেশি বলা হয়েছে, এর সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে নয়। বরং এটা পরকালীন ব্যাপার। পরকালে যখন বান্দার সামনে সব কিছুর রহস্য উন্মোচিত হবে তখন বুঝতে পারবে যে, সুদের মাধ্যমে বাড়ানো সম্পদের কোনই মূল্য ছিল না। বরং আজ ঐ সুদ আমার জন্য শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সাদকা দেয়া সম্পদ, যদিও অল্প দেয়া হয়েছে, তা বাড়তে বাড়তে আজ আমার হিসাবের খাতায় অনেক জমা হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মুফাসসিরগণ আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী মুফাসসিরগণের মত হলো, কুরআনের বক্তব্যটি দুনিয়া আখেরাত উভয় জায়গাতেই প্রযোজ্য। দুনিয়াতে যদিও হিসাবের দিক থেকে বাহ্যিকভাবে সুদের কারণে সম্পদ কমতে এবং সাদকার কারণে সম্পদ বাড়তে দেখা যায় না, কিন্তু অর্থনৈতিক মূলনীতি হিসেবে এটা স্পষ্ট এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, স্বর্ণ রৌপ্য স্বয়ং মানুষের উপকার করতে পারে না। না এর দ্বারা মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করা যায়, না বিছানো যায়, না পরিধান করা যায়, না রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথা ঢাকা যায়। এ সোনা-রূপা বিক্রি করে মানুষ বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে জীবনকে সাবলীল করে নিতে পারে।

এখানে এ বিষয়টি অনস্বীকার্য এবং অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, যাকাত-সাদকায় সম্পদ ব্যয় করলে ব্যক্তির সম্পদে আল্লাহ তাআলা এমন রবকত দান করেন, তার অল্প সম্পত্তিতে এত কাজ হয়ে যায় যে, তার সম্পদের চাইতে বেশি সুদী সম্পদের অধিকারী লোকও এত কাজ সম্পাদন করতে

সক্ষম হয় না। এমন দানশীল লোকের সম্পদে কোন বালা-মুসিবত আসে না বা কমই আসে। তার টাকা রোগের চিকিৎসায়, মামলা-মোকদ্দমা, টেলিভিশন-সিনেমা, থিয়েটার এবং বিনোদনের নামে অপকর্মে খরচ হয় না। ফ্যাশনপূজার অপব্যয় থেকে দূরে থাকে। আর তার প্রয়োজন অন্যের তুলনায় অল্প টাকায় মিটে যায়।

সুতরাং কাজ সম্পাদন ও ফলশ্রুতির দিক থেকে হারাম সুদী সম্পদের চেয়ে সাদকাদানকারীর কমে যাওয়া সম্পদও বেশি হয়ে গেল। বাহ্যিক হিসাবের দিক থেকে একজন তার একশ' টাকা থেকে দশ টাকা দান করে দিল। দেখা গেল তার দশ টাকা কমে নব্বই টাকা রয়ে গেল। কিন্তু সম্পদের মূল উদ্দেশ্য প্রয়োজন মেটানোর দিক থেকে তার একটুও কমেনি। উপরে বর্ণিত হাদীসের এটাই অর্থ। যেখানে ইরশাদ হয়েছে যে, সাদকার কারণে সম্পদ কমে না। বরং যা একশ' টাকায় সম্পাদন করা হতো তার চেয়েও বেশি কাজ সম্পাদন করা যাবে নব্বই টাকায়। সুতরাং এটা বলা অবান্তর নয় যে, তার সম্পদ বেড়ে গিয়েছে। নব্বই টাকায় এত কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে যা একশ' টাকায় সম্পাদন করা যেতো।

সাধারণ মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, সুদকে মুছে দেয়া এবং সাদকাকে বাড়িয়ে দেয়া– এটা পরকালীন ব্যাপার। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সুদখোরের সম্পদ কোন কাজে আসবে না; বরং তার সম্পদ তার শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সাদকা দানকারীর সম্পদ কিয়ামতের দিন অনন্ত নেয়ামতরাজি এবং চিরন্তন জান্নাতের কারণ হয়ে যাবে। এর কারণে সে চিরদিন আরাম আয়েশে থাকবে। আর সূক্ষ্মতাত্ত্বিক মুফাসসিরগণ যা বলেছেন তাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, এটা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। তাঁরা বলেছেন, সুদ মুছে যাওয়া এবং সাদকা বেড়ে যাওয়া– এটা পরকালীন ব্যাপার তো বটেই, কিন্তু দুনিয়াতেও এর ফল প্রকাশ পাবে। যে সম্পদের সাথে সুদ মিশে যায়, কখনও দেখা যায় যে, সে সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সাথে সাথে আসল সম্পদও নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- সুদ জুয়ার বাজারে প্রায়ই দেখা যায়, বড় বড় কোটিপতি ধনীরা মুহূর্তের মধ্যে দেউলিয়া আর পথের ফকিরে পরিণত হয়ে যায়। সুদ বিহীন বৈধ ব্যবসায়ও লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা আছে। অনেক বৈধ ব্যবসায়ী লোকসানের শিকারও হয়। কিন্তু এমন লোকসান যে, কোটিপতি মুহূর্তেই

ভিক্ষুক বনে যায়– এটা সুদী কারবারীদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অভিজ্ঞ লোকদের অনেক এমন পরিসংখ্যান প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, সুদী সম্পদ অধিকাংশই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কোন না কোন বালা-মুসিবত এসে সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। অনেকে বলেন, আমরা আল্লাহওয়ালাদের কাছে শুনেছি যে, সুদখোরের সম্পদ চল্লিশ বছর অতিক্রম করার আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

সুদী সম্পদের অকল্যাণ

যদিও কখনও দেখা যায় যে, কোন সুদখোরের সম্পদ ধ্বংস হয়নি, সম্পদের উপকারিতা, কল্যাণ এবং ফলশ্রুতি থেকে সে অবশ্যই বঞ্চিত হবে। কেননা, সম্পদ যেমন– সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি মানুষের মূল উদ্দেশ্য নয়। এগুলো স্বয়ং মানুষের কোন উপকার করতে পারে না। এসব চিবিয়ে খেলে ক্ষুধা মিটবে না। না পিপাসা নিবারণ করা যাবে, না কাপড়চোপড় বা থালা-বাসনের কাজ দিতে পারে। তারপরও মানুষ এসব অর্জন করার জন্য রাতকে দিন করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। শুধু এ জন্য যে, টাকা-পয়সা অর্জন করতে পারলে তার মাধ্যমে মানুষের জীবন সুখী হবে। প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে। যা মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা। এসব পূরণ করতে পারলে সে শান্তি ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারবে। এটা যেমন সে অর্জন করেছে, তেমনি তার সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধু-বান্ধবদেরও অর্জিত হয়। এগুলোই হলো ধন-সম্পদের উপকার এবং ফলশ্রুতি। সুতরাং বলা যায়, যার এসব অর্জিত হয়েছে, আসলে তার সম্পদ বর্ধিত হয়েছে। যদিও দেখতে কম দেখা যায়। যার এসব কম অর্জিত হয়েছে, তার আসলে সম্পদ কমেছে। যদিও দেখতে অনেক বেশি দেখা যায়। এটা বুঝার পর সুদী ব্যবসা আর দান-খয়রাতের তুলনামূলক একটা সমীক্ষা করুন– দেখবেন, যদিও সুদখোরের সম্পদ বাড়তে দেখা যায় কিন্তু এ বাড়াটা এমন যেমন একজন মানুষের শরীর বাতের কারণে ফুলে যায়। বাতের কারণে শরীর বাড়াটাও তো এক ধরনের বাড়া। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান মানুষ এই বাড়াটাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা সে জানে যে, এই বাড়াটা

মৃত্যুর পূর্বাভাস। তেমনি সুদখোরের সম্পদ যতই বাড়ুক না কেন, সেই সম্পদ থেকে উপকার লাভ করতে পারবে না। সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা এবং সম্মান থেকে বঞ্চিতই থাকবে।

সুদখোরের বাহ্যিক স্বচ্ছলতা একটা ধোকা

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, আজকাল তো সুদখোরদের খুব সুখে-শান্তিতে থাকতে দেখা যায়। তারা বিশাল ভবন আর অট্টালিকার মালিক। আরাম-আয়েশের সব উপকরণ সেখানে প্রস্তুত। পানাহার আর বসবাসের সীমাহীন বিলাসী সামগ্রী তাদের রয়েছে। চাকর-নকর ও নিরাপত্তাকর্মী হুকুমের অপেক্ষায় সদা তৈরি থাকে। জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, 'শান্তি-নিরাপত্তার উপকরণ' আর 'শান্তি-নিরাপত্তা' এর মধ্যে আকাশ-পাতালের ফারাক রয়েছে। শান্তির উপকরণ তো ফ্যাক্টরী আর কারখানায় তৈরি হয় এবং বাজারে বিক্রি হয়। টাকা-পয়সার বিনিময়ে এগুলো কিনে মালিক হওয়া যায়। কিন্তু 'শান্তি' যাকে বলে তা কোন মিল-কারখানায় তৈরি হয় না। না কোন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এটা এমন এক অনুভূতি, এমন এক রহমত যা সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দান করা হয়। যা কখনও অসহায়-দরিদ্র এমনকি জন্তু-জানোয়ারকেও দিয়ে দেয়া হয়। আবার কখনও বিশাল সম্পদশালী ব্যক্তিকেও দেয়া হয় না। একটি শান্তিকে নিয়েই চিন্তা করুন। তা হচ্ছে ঘুমের শান্তি। এটা পাওয়ার জন্য আপনি এটা করতে পারেন– শোয়ার জন্য একটা ভাল বাড়ি বানালেন। তাতে আলো-বাতাসের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। দৃষ্টি নন্দন আর চিত্তাকর্ষক ফার্নিচার দিয়ে বাড়িকে সুন্দর করে সাজালেন। শাহী খাট আর নরম নরম বিছানা বালিশের ব্যবস্থা করলেন। এসবের প্রভাবে কি আপনার ঘুম এসে যাবে? যদিও আপনার এ সমস্যা নেই তবু খবর নিয়ে দেখুন, হাজার হাজার মানুষ এমন আছে যারা বলবে– না, এতে ঘুম আসবে না। যাদের কোন না কোন সমস্যা এমন আছে যে, এসব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তাদের ঘুম হয় না। বিলাসী এসব সামগ্রী উজাড় পড়ে থাকে। কিন্তু ঘুম নেই। ঘুমের ট্যাবলেটও অনেক সময় অপারগতা জানিয়ে দেয়। ঘুমানোর আসবাবপত্র তো আপনি বাজার থেকে

কিনে নিয়ে আসলেন। কিন্তু ঘুম তো কোন বাজার থেকে বিরাট অংকের টাকায়ও কিনে আনতে পারেন না। অন্যান্য শান্তি ও স্বাদের ব্যাপারও একই রকম। সে সবের উপকরণ তো টাকা-পয়সার মাধ্যমে অর্জন করতে পারেন, কিন্তু শান্তি ও স্বাদ তা থেকে অর্জিত হওয়া জরুরি নয়। উপকরণ থাকার পরও শান্তি ও স্বাদ নাও পাওয়া যেতে পারে।

এখন সুদখোরদের অবস্থা নিরীক্ষণ করুন। দেখবেন, তাদের কাছে সব কিছু আছে। কিন্তু একটা জিনিসই তাদের কাছে পাবেন না। তা হলো শান্তি। তারা এক লাখকে দেড় লাখ, দেড় লাখকে দুই লাখ, দুই লাখকে আড়াই লাখ বানানোর মোহে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন একজন মোহগ্রস্ত অস্থির মানুষ। পানাহারের কোন চিন্তা নেই। পরিবার-পরিজনের কোন খবর নেই। কয়েকটি মিল-কারখানা চলছে। অন্য দেশ থেকে জাহাজ আসছে। এসবের দেখাশুনা করতেই সকাল রাত হয়ে যায়, আর রাত সকাল হয়ে যায়। কোথায় খাবার? কোথায় ঘুম। অস্থির এক শান্তির জীবন। আফসোস, এ পাগলেরা শান্তির উপকরণকেই শান্তি বুঝে বসে আছে। আসলে এরা শান্তি থেকে অনেক দূরে। যদি এসব মিসকিনেরা শান্তির ব্যাপারে একটু চিন্তা করতো তাহলে নিজেকে সবচেয়ে বড় অসহায়, সবচেয়ে বড় দরিদ্র অনুভব করতো। হযরত আযীযুল হাসান মাজযুব (রহ.) কি চমৎকার ভাষায় বলেছেন–

تو نے لیلیٰ جسے سمجھا وہ محمل ہو جائے

তুমি যাকে ভেবেছ লায়লী
না জানি তুমি ব্যর্থ প্রয়াসী!

এ হলো তাদের সুখ-শান্তির অবস্থা। এরপর তাদের সম্মানের অবস্থা দেখা যাক। এ ধরনের কঠিন অন্তরের লোকেরা দরিদ্র ও অসহায়দের দারিদ্রতা ও অসহায়ত্ব থেকে স্বার্থ হাসিল করে। তাদের রক্ত চুষে নিজেদের শরীর পালে। এজন্য লোকদের অন্তরে তাদের প্রতি কোন সম্মানবোধ থাকে না। আমাদের দেশের ব্যবসায়ী এবং ইউরোপ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদীদের ইতিহাস পড়লে দেখা যাবে, তারা বিশাল বিশাল সম্পদের মালিক হওয়ার পরও দুনিয়ার মানুষের কাছে তাদের কোন ইজ্জত-সম্মান ছিল না। বরং সাধারণ মানুষকে শোষণ করার কারণে তাদের প্রতি মানুষের

মনে হিংসা ও ঘৃণা জন্ম নিয়েছিল। আজ দুনিয়াতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে
পড়ার কারণ এটাই। দেশে দেশে যে যুদ্ধ চলছে তা এই হিংসা ও ঘৃণার
ফলশ্রুতি। পুঁজিপতি আর শ্রমিকের লড়াই সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম
দেয়। তারপর আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সামাজিক হিংসার এ
আগুন নেভাতে পারেনি। সেখানেও তৈরি হয়েছে বৈষম্য। আবার জেগে
ওঠে হিংসা। শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। যে যুদ্ধের ডামাডোল দুনিয়াকে জাহান্নাম
বানিয়ে ছাড়ে। এটাই হলো পুঁজিপতিদের শান্তি এবং সম্মান। অভিজ্ঞতার
আলোকে বলছি, সুদখোরদের সম্পদ তা ভবিষ্যত প্রজন্মকেও কলুষিত
করে। তাদের জীবন থেকেও শান্তি কেড়ে নেয়। সম্পদের মূল উদ্দেশ্য
অর্জনে তারা ব্যর্থ হয়। অপমানজনক জীবনযাপন করে।

ইউরোপিয়ানদের দেখে ধোকায় পড়ো না

সাধারণ মানুষ ইউরোপিয়ান সুদখোরদের আয়েশী জীবন দেখে ধোকায়
পড়তে পারে যে, ওরা তো বিশাল বিশাল ভবন আর অট্টালিকার মালিক।
আরাম আয়েশের সব উপকরণ সেখানে প্রস্তুত। পানাহার ও বসবাসের
এমনকি অপব্যয়ের সব ব্যবস্থা তাদের আছে। চাকর-নকর ও নিরাপত্তা
সম্বলিত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ সেখানে বিরাজ করে। কিন্তু একটু চিন্তা
করলেই বুঝা যাবে যে, শান্তির উপকরণ আর শান্তির মধ্যে বিরাট ফারাক
রয়েছে। শান্তির উপকরণ তো মিল-কারখানায় তৈরি হয়। বাজারে বিক্রি
করা হয়। টাকা-পয়সার বিনিময়ে তা অর্জন করা যায়। কিন্তু শান্তি যাকে
বলে তা কখনও কোন কারখানায় তৈরি হয় না। কোন বাজারে বিক্রি হয়
না। এটা এমন একটি রহমত যা সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে
দান করা হয়। কখনও অসহায় দরিদ্রকেও দান করা হয়। আবার কখনও
বিশাল সম্পদের মালিককেও দেয়া হয় না। ইউরোপিয়ানদের অবস্থাও
এমন। তাদের কাছে শান্তির উপকরণ তো আছে। কিন্তু শান্তি নেই।

তাদের উদাহরণ হলো, কোন মানুষখেকো অন্যের রক্ত চুষে খেয়ে নিজেকে
পারে। এমন কিছু লোক এক মহল্লায় বসবাস শুরু করে দেয়। আপনি
কাউকে ঐ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে রক্ত চোষার বরকত প্রত্যক্ষ করান আর
বলুন, এরা সবাই সুস্থ সবল, সুখী-সমৃদ্ধশালী। বুদ্ধিমান লোক যারা বিশ্ব

মানবতার সফলতা কামনা করে, তারা শুধু একটি মহল্লা দেখে না, এর
বিপরীত ঐসব মহল্লাও দেখে যাদের রক্ত চুষে নিয়ে আধমরা করে দেয়া
হয়েছে। গোটা জাতিকে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা শুধু একটি মহল্লা দেখে
খুশি হতে পারে না। সামগ্রিকভাবে তাদের কাজকে মানবতার উন্নতি বলে
আখ্যা দিতে পারে না। কেননা তাদের যেমন মানবখেকো জানোয়ারও
দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি অন্যান্য বস্তির জীবন্ত লাশগুলোও তাদেরকে বিব্রত
করে। গোটা মানবতার প্রতি দৃষ্টিদানকারী মানুষ ঐ মহল্লার মুষ্টিমেয় অবৈধ
সম্পদের অধিকারী লোকদেরকে দেখে মানবতার ধ্বংসলীলা বলতেই বাধ্য
হবে।

পক্ষান্তরে সাদকা-খয়রাতকারীকে দেখুন, তাদেরকে কখনও ওদের মতো
সম্পদের পেছনে অন্ধের মতো দৌড়াতে দেখবেন না। যদিও তাদের শান্তি
র উপকরণ কম, তারপরও তারা সবার চেয়ে বেশি শান্তি লাভ করে।
জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্রের মালিকদের চেয়ে তাদের শান্তি অনেক বেশি।
ধীরস্থির অন্তর যা আসল শান্তি, এটা সাদকা দানকারীরাই বেশি লাভ করে
থাকে এবং দুনিয়াবাসীরাও তাঁকে সম্মানের চোখে দেখে।

মোট কথা, আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলার ইরশাদ– 'সুদকে
মুছে দেবেন এবং সাদকাকে বাড়িয়ে দেবেন'-এর মর্মার্থ পরকালের
ব্যাপারে তো স্পষ্ট। পার্থিব ব্যাখ্যাও একেবারে খোলামেলা। প্রিয় নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরেকটি হাদীস পার্থিব ব্যাখ্যাকে
সমর্থন করছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ

সুদ যতই বেশি হোক না কেন, পরিণাম তার কমই।

হাদীসটি 'মুসনাদে আহমদ' ও 'ইবনে মাজা'তে উল্লিখিত হয়েছে।
আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ-

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ পাপীকে অপছন্দ
করেন।

এতে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফুরীতে নিমজ্জিত। আর যারা হারাম জানা সত্ত্বেও সুদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, তারা ফাসেক পাপী।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَO

অর্থাৎ হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যা আছে তা ছেড়ে দাও। যদি তোমরা মুমিন হও। [বাকারা : ২৭৮]

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَO

অর্থাৎ এরপর যদি তোমরা এর উপর আমল না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তোমরা তাওবা করে নাও, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমরা পেয়ে যাবে। না তোমরা কারও প্রতি জুলুম করতে পারবে, না কেউ তোমাদের প্রতি জুলুম করতে পারবে। [বাকারা : ২৭৯]

দুটো আয়াতেরই শানে নুযূল 'সংশয় ও ভুল ধারণা'-এর আলোচনায় এসে গিয়েছে। বনু সাকিফ গোত্র সুদী ব্যবসায় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল। তারা কুফরী অবস্থায় বলেছিল–

اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا

নিশ্চয়ই ব্যবসা তো সুদের মতই।

নবম হিজরীতে এরা মুসলমান হয়ে যায়। তাদের আরেক মিত্র গোত্র বনু মুগীরাও মুসলমান হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণ করার পর সুদী কারবার তো

সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু বকেয়া সুদী কিছু লেনদেন বনু সাকীফ ও বনু মুগীরার মধ্যে চলছিল। প্রাপক ঋণগ্রহীতাকে বকেয়া সুদ পরিশোধের জন্য চাপ দিল। ঋণগ্রহীতা বকেয়া সুদ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানালে তা মক্কার গভর্নরের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে গেল। [দুররে মানসুর]

তেমনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর শেয়ারে ব্যবসা ছিল। তাঁরাও বনু সাকীফ গোত্রের কাছে বকেয়া সুদ পেতেন। [দুররে মানসুর]

হযরত উসমান (রা.)ও অন্য এক ব্যবসায়ীর কাছে সুদ প্রাপ্য ছিলেন। এটাও ছিল বকেয়া সুদ। রিবা হারাম সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর নতুনভাবে সুদী লেনদেন বন্ধ করে দিলেও আগে থেকে চলে আসা পুরোনো সুদী লেনদেন চালু ছিল। এরই প্রেক্ষিতে এ দুটো আয়াত নাযিল হয়। যার সারাংশ হলো, সুদের অবৈধতা নাযিল হওয়ার পর সুদের বকেয়া টাকা লেনদেনও আর বৈধ নয়। শুধু এটুকু ছাড় আছে যে, অবৈধতা নাযিলের আগে যে সুদ নেয়া হয়ে গিয়েছে, তা থেকে অর্জিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বা নগদ ক্যাশ যাদের কাছে ছিল তা তাদের জন্য বৈধ রাখা হয়েছে। আর যা এখনও আদায় হয়নি তা আদায় করা বৈধ নয়।

সবাই কুরআনের এ বিধান শুনে সে অনুযায়ী যার যার সুদের দাবী ছেড়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদী লেনদেনের মারাত্মক পরিণতির কথা বিবেচনা করে বিদায় হজের ভাষণে এ সম্পর্কে সতর্কবাণী এবং পেছনের চলমান সব সুদী লেনদেনকে রহিত ঘোষণা করেন। যে ভাষণ দেড় লাখ সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সামনে নবীজীর শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ছিল, যেখানে ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ভালো করে বুঝে নাও, জাহিলী যুগের সব অপসংস্কৃতি পদদলিত করা হলো। জাহিলী যুগের হত্যার প্রতিশোধ রহিত করা হলো। প্রথমেই আমি আমার নিকটাত্মীয় রবীয়া ইবনে হারিসের হত্যার প্রতিশোধ রহিত করে দিলাম। যাকে বনী সাদ গোত্রে দুধপান করার জন্য দেয়া হয়েছিল। হুযায়ল তাকে হত্যা করেছিল। তেমনি জাহিলী যুগের সুদ রহিত করা

হয়েছে। প্রথমেই আমার চাচা আব্বাস (রা.)-এর জাহিলী যুগের অপরিশোধ্য সুদকে রহিত ঘোষণা করছি।

এ উভয় আয়াতের প্রথম আয়াতটি (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ) বলে শুরু করা হয়েছে। যাতে আল্লাহর ভয়ের মাধ্যমে সামনে বর্ণিত বিধানটি মানা সহজ করার পথ অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহর ভয় এবং পরকালের বিশ্বাস এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে মানুষের সব সমস্যার সমাধান এবং সব তিক্ত জিনিস মিষ্ট হয়ে যায়। এরপর ইরশাদ করেন–

وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا

অর্থাৎ সুদের পুরনো লেনদেন ছেড়ে দাও। এরপর আয়াতের শেষে বিধানটিকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ যদি তোমরা মুসলমান হও।

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরনো সুদের অবশিষ্ট টাকা আদায় করাও মুসলমানের কাজ নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর এ বিধানের বিরোধিতাকারীদেরকে কঠিন পরিণতির ভয় দেখানো হয়েছে। যার সারমর্ম হলো, যদি তোমরা সুদ না ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কুফর ছাড়া আর কোন গুনাহর ক্ষেত্রে এমন ভীষণ সাবধানবাণী কুরআন-হাদীসের কোথাও দেখা যায় না। যা প্রমাণ করে সুদের গুনাহ একটা কঠিন শাস্তিযোগ্য জঘন্যতম গুনাহ। দ্বিতীয় এ আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝

অর্থাৎ যদি তোমরা সুদ ছেড়ে তাওবা করে নাও এবং পুরোনো সুদের লেনদেনও ছেড়ে দেয়ার পাক্কা ইরাদা

করে নাও, তাহলে বৈধভাবে তোমাদের মূলধন তোমরা পেয়ে যাবে। তোমরাও মূলধন থেকে বাড়তি আদায় করে কারও প্রতি জুলুম করতে পারবে না। আর অন্য কেউ মূলধন থেকে কর্তন করে বা পরিশোধে দেরী করে তোমাদের প্রতি জুলুম করতে পারবে না।

এখানে মূলধনের বাড়তি অংশ অর্থাৎ সুদকে জুলুম বলে সুদের অবৈধতার কারণ হিসেবে ইঙ্গিত করেছেন। সুদ যদি ব্যক্তি পর্যায়ে হয় তাহলে দরিদ্রের প্রতি জুলুম করা হয়। আর ব্যবসায়ী সুদ হলে তা পুরো জাতির প্রতি জুলুম করা হয়। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আয়াতে মূলধন ফেরত পাবার জন্য সুদ ছেড়ে তাওবা করার শর্ত লাগানো হয়েছে। এর ব্যাখ্যা দাঁড়ায়, যদি সুদ ছেড়ে তাওবা না কর তাহলে তোমাদের মূলধনও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

তাফসীর ও ফেকাহ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেন– সুদ ছেড়ে তাওবা না করার অনেক প্রক্রিয়া এমনও আছে যাতে মূলধন খোয়া যেতে পারে। যেমন- সুদকে হারামই মনে করে না। এটা কুরআনের প্রকাশ্য বিরোধিতা। জিদের বশবর্তী হয়ে আইন ভঙ্গ করার জন্য করা হলো। সে হলো দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে (বাইতুল মালে) জমা করে দেয়া হয়। যখন সে তাওবা করে সুদ ছেড়ে দেবে তখন তার মূলধন তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

সম্ভবত এ ধরনের বিরোধিতাকারীদেরকে ইঙ্গিত করেই ইরশাদ করা হয়েছে–

اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ

অর্থাৎ যদি তোমরা তাওবা না কর তাহলে তোমাদের মূলধন বাজেয়াপ্ত হয়ে যেতে পারে।

পঞ্চম আয়াত

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا

مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থাৎ হে মুমিনেরা! চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। [আলে ইমরান : ১৩০]

এ আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। জাহিলী আরব সমাজে সুদ খাওয়ার সাধারণ প্রথা এমন ছিল যে, একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়া হতো। সময় হওয়ার পর ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করলে ঋণদাতা সুদের হার বৃদ্ধির শর্তে সময় বাড়িয়ে আরেকটি সময় নির্ধারণ করে দিত যেদিন সে পরিশোধ করবে। সামনের তারিখেও অপারগ হলে আবার সুদের হার বাড়িয়ে দিয়ে সময়ও বাড়িয়ে দিত। এভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের লেনদেন হতো। ঘটনাটি অধিকাংশ তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত 'লুবাবুন্ নুকূল' কিতাবে হযরত মুজাহিদ (রহ.)-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে। জাহিলী আরবের সমাজ বিধ্বংসী এ কুপ্রথার মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ তাআলা এ আয়াতখানা অবতীর্ণ করেন। আয়াতে اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً বা 'চক্রবৃদ্ধি হারে' শব্দ ব্যবহার করে তাদের প্রচলিত সুদ প্রথার নিন্দা প্রকাশ করেছেন। সমাজ বিধ্বংসী বুর্জোয়া সংস্কৃতির ব্যাপারে সবাইকে সাবধান করে তাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এখানে 'চক্রবৃদ্ধি হারে' শব্দটি সংযোজন করার অর্থ এই নয় যে, যে কারবারে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদী লেনদেন না হয় তা অবৈধ নয়। অবশ্যই তাও অবৈধ। কেননা, সূরা বাকারা ও সূরা নিসাতে সাধারণ সুদের অবৈধতা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে হোক বা না হোক। উদাহরণত বলা যায়, কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইরশাদ হয়েছে–

لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

অর্থাৎ তোমরা আমার আয়াতকে অল্প মূল্যে বিক্রি করো না।

'অল্প মূল্য' শব্দটি এজন্য বলা হয়নি যে, বেশি মূল্যে বিক্রি করা যাবে। এটা এজন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতসমূহ এতই অমূল্য যে, একটি

আয়াতের বিনিময়ে যদি আসমান জমিনের সব সম্পদও নিয়ে নেয়া হয় তবুও তা কমই হবে। তেমনি আলোচ্য আয়াতে চক্রবৃদ্ধি হারে শব্দটি সুদের জঘন্য শোষণরীতির প্রতি কটাক্ষ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

যদি আধুনিক যুগের সুদের চিত্তাকর্ষক প্রকারগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায়, তবে দেখা যাবে যে, যখন সুদ খাওয়ার সাধারণ অভ্যাস গড়ে ওঠে তখন সুদ শুধু সুদই থাকে না; বরং তা চক্রবৃদ্ধি হারের আকার ধারণ করে। সংক্রামক ব্যাধির মত সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সুদের যে টাকা সুদখোরের সম্পদে যোগ হয়েছে সে টাকাও সুদখোর সুদী কারবারে ব্যবহার করতে থাকবে। সুতরাং সুদী কারবার চক্রবৃদ্ধির আকারে চলতে থাকবে। এভাবে সব সুদই চক্রবৃদ্ধির আকারে বিস্তৃত হতে থাকবে। তাছাড়া সুদী ঋণে যখন আসল ঋণের পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে এবং সময়ের সুদ নেয়া হয়, তখন এক যুগ পর প্রত্যেক সুদের পরিমাণ মূলধনের দ্বিগুণ তিনগুণ বা ততধিক হয়ে যায়।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম আয়াত

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۝ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

অর্থাৎ ইহুদীদের বড় বড় অপরাধ এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফেরানোর জন্য শাস্তিস্বরূপ অনেক হালাল জিনিস তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি। আরেকটি কারণ হলো, তারা সুদ গ্রহণ করতো। অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। আর তারা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাত করতো। তাদের মধ্যকার কাফেরদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। [নিসা : ১৬০-১৬১]

এ আয়াত দুটোতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের জন্য এমন অনেক জিনিস হারাম করা হয়েছিল যা আসলে হারাম নয়। কেননা প্রত্যেক শরীয়তে ঐসব জিনিস হারাম করা হয় যা মূলত নোংরা ও ক্ষতিকারক। মানুষের শারীরিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক। অবশিষ্ট সব পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জিনিসকে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য হালাল ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ইহুদীদের উপর্যুপরি অপরাধ ও গুনাহের শাস্তি যা যা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে এটাও একটা যে, অনেক হালাল জিনিসকে তাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আনআমে এসেছে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ۔

এরপর তাদের কৃত অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেসব অপরাধের কারণে তাদেরকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছে। এসব পোড়াকপালীরা নিজেরা তো হেদায়াতের পথ পরিহার করেছিল, সাথে সাথে এ অপরাধও তারা করেছিল যে, অন্যদেরকেও হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করতো।

আরেকটি অপরাধ তারা করতো, সেটা হলো সুদ খাওয়া। অথচ সুদ তাদের জন্যও হারাম ছিল। কুরআনের এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সুদ বনী ইসরাঈলের জন্যও হারাম করা হয়েছিল। আজ তাওরাতের যে সংস্করণ তাদের হাতে আছে, যদিও সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, তাওরাতের বর্তমান সব সংস্করণই বিকৃত সংস্করণ, তারপরও তাতে কোন না কোনভাবে সুদের অবৈধতার আলোচনা এখনও সংযোজিত রয়েছে।

অনেক তাফসীরবিদ উলামা বলেন, রিবা বা সুদ প্রত্যেকটি শরীয়তে হারাম ছিল। মোট কথা, আয়াতটিতে ইহুদীদের যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তার একটি কারণ হলো, তারা সুদ খেতো। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন জাতি আল্লাহ তাআলার গযবে পতিত হয়, তার বহির্প্রকাশ এভাবে ঘটে যে, তাদের সমাজে সুদের সাধারণ প্রচলন হয়ে যায়।

অষ্টম আয়াত

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ۝

অর্থাৎ আর তোমরা লোকদের সম্পদে যা কিছু এজন্য যোগ কর যে, তাতে সম্পদ বেড়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার কাছে তা বাড়ে না। আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাকাত হিসেবে যা দান করবে, তারা আল্লাহর কাছে এটা বাড়াতে থাকবে। [সূরা : রূম : ৩৯]

অনেক তাফসীরবিদ উলামা রিবা ও বাড়া শব্দের প্রতি লক্ষ করে এ আয়াতকেও সুদের বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এর ব্যাখ্যা করেছেন, সুদ নেয়াতে যদিও ব্যাহ্যত প্রত্যেক সম্পদ বাড়তে দেখা যায়, কিন্তু আসলে এটা বৃদ্ধি নয়। যেমন কোন বাত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীর ফুলে যাওয়ার কারণে বাহ্যত বৃদ্ধি দেখা যায়, কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ বৃদ্ধিতে আনন্দিত হয় না। বরং এটা ধ্বংসের কারণ মনে করে। পক্ষান্তরে যাকাত সাদকা দেয়াতে বাহ্যত সম্পদ কমতে দেখা গেলেও আসলে তা কমে না। বরং এটা হাজার গুণ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কেউ শরীরের বিষাক্ত অংশ ফেলে দেয়ার জন্য অপারেশন করে বা বিষাক্ত রক্ত বের করে দেয়। তখন বাহ্যত তাকে দুর্বল ও ক্ষীণ দেখা গেলেও বুদ্ধিমানরা এ দুর্বলতাতে শক্তিশালী হওয়ার কারণ মনে করেন।

অনেক আলেম আবার এ আয়াতকে সুদের বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। বরং তারা এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন– যে ব্যক্তি কাউকে তার সম্পদ দুনিয়াবী কোন স্বার্থে দান করে, যেমন কেউ এই মনে করে অন্যকে দান করলো যে, সে আমাকে এর বিনিময়ে দ্বিগুণ দান করবে। এটা আসলে হাদিয়া বা দান নয়। বিনিময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে। এটা যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়নি বরং স্বার্থোদ্ধারের জন্য দান করেছে, তাই আল্লাহ তাআলা বলেন– এভাবে যদিও অন্যদের দ্বিগুণ বিনিময় পেয়ে নিজেদের সম্পদ বেড়ে যায় কিন্তু

আল্লাহ তাআলার কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত সাদকা দেয়া হয়, তাহলে বাহ্যত তা কমতে দেখা গেলেও আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়।

এমনই অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন–

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

> অর্থাৎ হে নবী! আপনি কাউকে এ নিয়তে দান করবেন না যে, তার বিনিময়ে আমি দ্বিগুণ অর্জন করতে পারবো।

এখানে বাহ্যত দ্বিতীয় তাফসীরই যৌক্তিক মনে হচ্ছে। প্রথমত এজন্য যে, সূরা রূম মাক্কী সূরা। যদিও সূরা মাক্কী হলে তার প্রত্যেকটি আয়াত মাক্কী হতে হবে এমনটি জরুরি নয়। তবুও মাক্কী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপরীত কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়। আয়াতটি মাক্কী হলে এ আয়াত সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে হতে পারে না। কারণ, সুদ হারাম হয়েছে মদীনায়। তাছাড়া এর পূর্বের আয়াতগুলোতে যা আলোচনা করা হয়েছে তাতে মনে হয় দ্বিতীয় তাফসীরই এখানে প্রযোজ্য। এর আগের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط
ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۝

> অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং মুসাফিরকে তার অধিকার দাও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এটা তাদের জন্য উত্তম।

এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে এ শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এর পরের আয়াতে অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, কেউ তার সম্পদ কাউকে যদি এ উদ্দেশ্যে দান করে যে, বিনিময়ে ঐ ব্যক্তি দ্বিগুণ দান করবে, তাহলে এটা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হলো না। সুতরাং এর সওয়াব পাওয়া যাবে না।

যাক, সুদ সম্পর্কে এ আয়াত ছাড়াও সাতটি আয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতে চক্রবৃদ্ধি হারের সুদের অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে। অবশিষ্ট ছয়টি আয়াতে সাধারণ সুদের অবৈধতা ঘোষণা করা হয়েছে। বিস্তারিত এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সুদ চাই তা চক্রবৃদ্ধি হারে হোক বা সুদের ভেতর সুদ বা ব্যবসায়ী সুদ যাই হোক না কেন, সবই স্পষ্ট হারাম। হারাম আবার এমন বিপজ্জনক হারাম যে এর বিরোধিতাকারীদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে সুদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। রিবা বা সুদ সম্পর্কিত কুরআন মজীদের সাতটি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

এখন আমরা এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দেখবো। আসল বিষয় এবং তার বিধি-বিধান ভালো করে বুঝে নেয়ার জন্য তো কয়েকটি হাদীসই যথেষ্ট। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে এ সম্পর্কিত সব হাদীস ও তৎসম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ একত্রে সন্নিবেশন করা যুক্তিযুক্ত মনে হলো। তাই আমার কাছে হাদীসের যেসব গ্রন্থ রয়েছে তা থেকে এ বিষয়ে যতগুলো হাদীস পেয়েছি তার সবই অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করছি।

সুদ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অমর বাণী

১.

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ- (بخارى، مسلم، ابوداود نسائى)

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বাঁচ। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন– হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি বিষয় কী? ইরশাদ করেন– আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করা। জাদু করা। অন্যায়ভাবে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কাউকে হত্যা করা। সুদ খাওয়া এবং এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। জেহাদ থেকে ভেগে যাওয়া। সাদাসিধে পবিত্র মুসলমান রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ]

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অংশীদার বানানোকে শিরক বলে। যেমন- আল্লাহ তাআলার মত অন্য কাউকে ইবাদত পাওয়ার যোগ্য বিশ্বাস করা। তার নামে মান্নত করা। কারও জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিধি আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও ক্ষমতার সমমানের মনে করা। ইবাদতের সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও

জন্য সম্পাদন করা। যেমন- রুকু সিজদা বা তাওয়াফ ইত্যাদি। আল কুরআন ঘোষণা করেছে, কেউ যদি তাওবা ছাড়া শিরক অবস্থায় মারা যায় তবে তাকে কোনভাবে ক্ষমা করা হবে না।

২.

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَاَخْرَجَانِىْ اِلٰى اَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِّنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلٰى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِى النَّهْرِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِىْ فِيْهِ فَرَدَّهٗ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِىْ فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَاهٰذَا الَّذِىْ رَاَيْتَهٗ فِى النَّهْرِ قَالَ اٰكِلُ الرِّبَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ هٰكَذَا فِى الْبُيُوْعِ مُخْتَصَرًا وَتَقَدَّمَ فِىْ تَرْكِ الصَّلَاةِ مُطَوَّلًا-

অর্থাৎ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখলাম, দুইজন লোক আমার কাছে আসলো। তারা আমাকে এক পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চললো। পথে একটি রক্তের নদীর কাছে পৌছলাম। নদীর মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আর কিনারায় এক লোক ছিল। তার সামনে অনেক পাথর পড়ে আছে। নদীর মধ্যখানে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি পাড়ে এসে যখনই নদী থেকে উঠতে চায়, তখনই পাড়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি এত জোরে তার মুখে পাথর ছুঁড়ে মারে যে, সে পাথরের আঘাতে তার পূর্বের

জায়গায় গিয়ে পড়ে। এভাবে সে যখনই নদী থেকে ওঠার চেষ্টা করে তখনই পাড়ে দাঁড়ানো ব্যক্তি সজোরে পাথর মেরে তাকে পূর্বের জায়গায় পৌঁছে দেয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীকে জিজ্ঞেস করেন, রক্তের নদীতে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি কে? তিনি বলেন– সে হলো সুদখোর। [বুখারী]

৩.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِىْ وَرَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَزَادُوْا فِيْهِ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ-

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ দাতা ও সুদগ্রহীতা উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেন।

ইমাম মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হিব্বান হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলেছেন। অন্য একটি বর্ণনায় 'সুদের সাক্ষ্যদানকারী এবং সুদী কারবার লেখকের উপরও অভিসম্পাত করেছেন।'– এ বক্তব্যও সংযোজিত হয়েছে।

৪.

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ-

অর্থাৎ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদী হিসাব লেখক এবং সুদের সাক্ষ্যদানকারীর প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন, গুনাহগার হিসেবে এরা সবাই সমান। [মুসলিম]

৫.

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ سَبْعٌ اَوَّلُهُنَّ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَاَكْلِ الرِّبَا وَاَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ وَفِرَارِيَوْمِ الزَّحْفِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ وَالْاِنْتِقَالِ اِلَى الْاَعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَتِهٖ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِوبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَلَا بَأْسَ بِهٖ فِى الْمُتَابِعَاتِ-

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– কবীরা গুনাহ সাতটি। ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। ৩. সুদ খাওয়া। ৪. এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। ৫. জিহাদ থেকে পলায়ন করা। ৬. সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা। ৭. হিজরত করার পর পূর্বের বাড়িতে ফিরে যাওয়া। বাযযার (রহ.) আমর ইবনে আবু শায়বা'র সনদে এটা বর্ণনা করেছেন।

৬.

وَعَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَنَهَى

عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِي وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابُوْدَاوُدَ قَالَ الْحَافِظُ اَبِى جُحَيْفَةَ وَهَبُ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّوَائِيُّ-

অর্থাৎ হযরত আউন ইবনে আবু জুহাইফা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্কী পরিহিতা মহিলা এবং উল্কী পরিয়ে দেয় এমন মহিলার প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। সুদদাতা ও সুদগ্রহীতার প্রতিও অভিশাপ দিয়েছেন। কুকুর ব্যবসা এবং পতিতাবৃত্তি থেকে নিষেধ করেছেন। আর প্রতিকৃতি তৈরিকারীর প্রতি লানত করেছেন। [বুখারী, আবু দাউদ]

৭.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اٰكِلُ الرِّبَا وَمُوْكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ كَاتِبَاهُ اِذَا عَلِمُوْا بِهِ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْ شِمَةُ لِلْحُسْنِ وَلَا وِى الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدِ أَعْرَابِيَّةً بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُوْنُوْنَ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْيَعْلٰى وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهَا وَزَادَ فِىْ اٰخِرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (قَالَ الْحَافِظُ) رَوَاهُ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَارِثِ وَهُوَالْاَعْوَرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اِلَّا ابْنُ خُزَيْمَةَ فَاِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ-

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা উভয়ের সাক্ষ্যদাতা, উভয়ের লেখক, জেনে বুঝে যদি সুদ

সংক্রান্ত এসব কাজ করে, সৌন্দর্যের জন্য উল্কী পরিহিতা মহিলা ও উল্কী যে অংকন করে দেয় এমন মহিলা, দান-সাদকাকে যে দেরি করে, হিজরতের পর নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তনকারী– এরা সবাই (কিয়ামতের দিন) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিশাপের উপযুক্ত হবে। [আহমদ, আবু ইয়ালা, ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান (রহ.) তাদের সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।]

৮.

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلرَّابِعُ حَقٌّ عَلَى اللهِ اَنْ لَّا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيْقَهُمْ نَعِيْمَهَا مُدْمِنَ الْخَمْرِ والخمر وَاٰكِلَ الرِّبَا وَاٰكِلَ مَالِ الْيَتِيْمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْعَاقَّ لِوَالِدَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ وَهُوَ رَوَاهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ -

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আল্লাহ তাআলা চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না বলে মনস্থ করেছেন। এমনকি তাদেরকে জান্নাতের নেয়ামতের স্বাদও চাকাবেন না। এক. মদখোর, দুই. সুদখোর, তিন. অন্যায়ভাবে এতীমের সম্পদ বিনষ্টকারী, চার. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। [ইব্রাহীম ইবনে খাসীম ইবনে এরাক থেকে হাকিম বর্ণনা করেন এবং বলেন, এর সনদ সহীহ]

৯.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثٌ

وَسَبْعُوْنَ بَابًا اَيْسَرَهَا مِثْلَ اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِىْ
وَمُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ مِنْ طَرِيْقِ الْحَاكِمِ ثُمَّ قَالَ
هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَالْمَتْنُ مُنْكَرٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَا
اَعْلَمُهٗ اِلَّا وَهْمًا وَكَاَنَّهٗ دَخَلَ لِبَعْضِ رُوَاتِهٖ اِسْنَادٌ
فِىْ اِسْنَادٍ۔

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– সুদের তিয়াত্তরটি মুসীবত রয়েছে। সবচেয়ে নিম্নতম মুসীবত হলো, নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মুসীবত। [হাকীম এটা বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী-মুসলিমের ধারায় (শর্তে) সহীহ বলেছেন।]

১০.

وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَلرِّبَا
بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذٰلِكَ رَوَاهُ
الْبَزَّارُ وَرُوَاتُهٗ رُوَاةُ الصَّحِيْحِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ
بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ بِاخْتِصَارٍ وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذٰلِكَ۔

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– সুদের সত্তরোর্ধ ক্ষতিকারক পরিণতি রয়েছে এবং তা শিরকের সমপর্যায়ভুক্ত। [হাদীসখানা বায্যার (রহ.) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহীহ।]

১১.

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ بَابًا اَدْنَاهَا

كَالَّذِىْ يَقَعُ عَلٰى اُمِّهٖ رَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ بِاِسْنَادٍ لَابَاْسَ
بِهٖ ثُمَّ قَالَ غَرِيْبٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَاِنَّمَا يُعْرَفُ بِعَبْدِ
اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ يَعْنِى ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ عَبْدُ
اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ هٰذَا مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ۔

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– সুদের সত্তর প্রকার ক্ষতিকর মুসীবত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন মুসীবত হলো, নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমতুল্য।

১২.

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّرْهَمُ يُصِيْبُهُ
الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَّثَلَاثِيْنَ
زَنْيَةً يَزْنِيْهَا فِى الْاِسْلَامِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ فِى
الْكَبِيْرِ مِنْ طَرِيْقِ عَطَاءٍ وَالْخُرَاسَانِىِّ عَنْ عَبْدٍ
وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَرَوَاهُ اِبْنُ اَبِى الدُّنْيَا وَالْبَغَوِىُّ
وَغَيْرُهُمَا مَوْقُوْفًا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ
وَلَفْظُ الْمَوْقُوْفِ فِىْ اَحَدِ طُرُقِهٖ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَلرِّبَا
اِثْنَانِ وَّسَبْعُوْنَ حُوْبًا اَصْغَرُهَا حُوْبًا كَمَنْ اَتٰى اُمَّهٗ
فِى الْاِسْلَامِ وَدِرْهَمٌ مِّنَ الرِّبَا اَشَدُّ مِنْ بِضْعٍ
وَّثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً قَالَ وَيَاْذَنُ اللّٰهُ بِالْقِيَامِ لِلْبِرِّ وَالْفَاجِرِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا اٰكِلَ الرِّبَا فَاِنَّهٗ لَا يَقُوْمُ اِلَّا كَمَا
يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ۔

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– কেউ যদি সুদের মাধ্যমে একটি দিরহাম অর্জন করে আল্লাহ তাআলার কাছে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তেত্রিশবার ব্যভিচার করার চাইতেও বড় অপরাধী বিবেচিত হবে।

হাদীসটি আল্লামা তাবারানী তাঁর কবীর গ্রন্থে আতা আল্ খুরাসানীর সনদে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেন। যদিও তার সিমায় (سمع) প্রমাণিত নয়। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন– সুদের বাহাত্তরটি গুনাহ রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুনাহ একজন মুসলমান তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমতুল্য। এক দিরহাম সুদ ত্রিশাধিকবার ব্যভিচার করার চেয়ে নিকৃষ্ট। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন প্রত্যেক সৎকাজ ও অসৎ কাজ সম্পাদনকারীকে দাঁড়ানোর অনুমতি দেবেন। কিন্তু সুদখোরকে সুস্থ-সবলদের মত দাঁড়ানোর সুযোগ দেবেন না। বরং সে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন শয়তান তাকে আক্রমণ করে হুশহারা করে দিয়েছে।

১৩.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيْلَ الْمَلَائِكَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زَنْيَةٍ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِىْ فِى الْكَبِيْرِ وَرِجَالُ اَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيْحِ قَالَ الْحَافِظُ حَنْظَلَةُ وَالِدُ عَبْدِ اللهِ لُقِّبَ بِغَسْلِ الْمَلٰئِكَةِ لِاَنَّهُ كَانَ يَوْمَ اُحُدٍ جُنُبًاوَ قَدْ غَسَلَ اَحَدُ شِقَّىْ رَأْسِهِ فَلَمَّا سَمِعَ الصَّيْحَةَ خَرَجَ فَاسْتُشْهِدَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلٰئِكَةَ تَغْسِلُهُ۔

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হান্যালা (রা.) (যাঁকে ফেরেশতারা মৃত্যুর পর গোসল করিয়েছিলেন) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– সুদ হিসেবে এক দিরহাম খাওয়া ছত্রিশটি ব্যভিচারের চাইতেও ভীষণতর। যদি সে জানে যে, দিরহামটি সুদের।

হাদীসটি ইমাম আহমদ ও তাবারানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদের সনদ সহীহ বুখারীর সনদের সমপর্যায়ের।

হযরত হান্যালা (রা.)কে গাসীলুল মালাইকা (যাকে ফেরেশতারা মৃত্যুর পর গোসল করিয়েছিলেন) এজন্য বলা হয় যে, যখন উহুদ যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হলো, তখন সাহাবায়ে কিরাম জিহাদের উদ্দেশে বের হতে থাকেন। ঐ সময় হযরত হান্যালা স্ত্রী সহবাস পরবর্তী ফরয গোসলের জন্য বের হয়েছেন মাত্র। ঠিক ঐ মুহূর্তে তাঁর কানে জিহাদের দাওয়াত এসে লাগে। তিনি গোসলের দেরী সইতে না পেরে সাথে সাথে বের হয়ে পড়েন এবং সাহাবাদের জামাতে এসে শরীক হন। তাঁর উপর গোসল ফরয। ঐ অবস্থায় তিনি উহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে যান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি দেখেছি, ফেরেশতারা তাকে গোসল করাচ্ছেন।

১৪.

وَرُوِىَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَمْرَ الرِّبَا وَعَظَّمَ شَاْنَهٗ وَقَالَ اِنَّ الدِّرْهَمَ يُصِيْبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ فِى الْخَطِيْئَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً يَزْنِيْهَا الرَّجُلُ وَاَنَّ اَرْبَى الرِّبَاعِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ رَوَاهُ ابْنُ اَبِى الدُّنْيَا فِىْ كِتَابِ ذَمِّ الْغِيْبَةِ وَالْبَيْهَقِىْ۔

অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। তাতে সুদের ব্যাপারটি খুব গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন– কারও পক্ষে সুদের একটিমাত্র দিরহাম খাওয়া আল্লাহ তাআলার কাছে ছত্রিশটি ব্যভিচার থেকেও জঘন্যতম গুনাহ। তারপর ইরশাদ করেন– সবচেয়ে বড় সুদ হলো, কোন মুসলমানের সম্মানহানি করা।

হাদীসখানা ইমাম বাইহাকী ও ইবনে আবুদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেন।

১৫.

وُرِیَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اَكَلَ دِرْهَمًا مِّنْ رِبًا فَهُوَ مِثْلُ ثَلَاثَةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِیْ فِی الصَّغِيْرِ وَالْاَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِیْ-

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি কোন জালেমের পক্ষে এবং সত্যের বিরুদ্ধে সাহায্য করে, যেন সৎপন্থীর অধিকার বিনষ্ট হয়– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খায়, তার এ অপকর্ম তেত্রিশটি ব্যভিচারের সমতুল্য। যার শরীরের গোশত হারাম মাল থেকে তৈরি হয় সে দোযখের উপযুক্ত।

১৬.

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضی الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرِّبَا اِثْنَانِ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا اَدْنَاهَا مِثْلُ اِتْيَانِ الرَّجُلِ اُمَّهٗ وَاَنَّ اَرْبَى الرِّبَا اِسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِیْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِیْ فِی الْاَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ وَقَدْ وُثِّقَ-

অর্থাৎ হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– সুদের বাহাত্তরটি দরজা আছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে ছোট দরজা নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমতুল্য। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সুদ হলো, মানুষ তার ভাইয়ের সম্মানহানি করা। [তাবারানী]

১৭.

وَعَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِیْ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِیْ مَعْشَرَ وَقَدْ وُثِّقَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِیْ عَنْهُ-

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– সুদের সত্তরটি গুনাহ রয়েছে। আর সর্বনিম্ন পর্যায়ের গুনাহ হলো নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমতুল্য। [ইবনে মাজাহ, বায়হাকী]

১৮.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَشْتَرِىَ الثَّمْرَةَ حَتّٰى تُطْعِمَ وَقَالَ اِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِىْ قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحَ الْاِسْنَادِ-

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল পাকার আগে তা বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন– কোন অঞ্চলে সুদ এবং ব্যভিচার প্রসার লাভ করা আল্লাহর আযাবকে ডেকে আনার শামিল।

হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন, এর সনদ সহীহ।

১৯.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيْهِ مَاظَهَرَ فِىْ قَوْمٍ الزِّنَا وَالرِّبَا اِلَّا اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ رَوَاهُ اَبُوْ يَعْلٰى بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ-

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার এবং সুদ প্রসার লাভ করে, সে জাতি আল্লাহর আযাবকে নিজেদের উপর ত্বরান্বিত করে।

আবু ইয়ালা হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেন।

২০.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّبَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّبَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ رَوَاهُ اَحْمَدُ بِاِسْنَادٍ فِيْهِ نَظْرٌ-

অর্থাৎ হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে সুদ প্রসার লাভ করবে সে জাতি নিঃসন্দেহে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে যাবে। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের প্রসার ঘটবে, সে জাতিকে কাপুরুষতা পেয়ে বসবে। [আহমদ]

২১.

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِىْ اَمَّا اِنْتَهَيْنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقِىْ فَاِذَا اَنَا بِرَعْدٍ وَّ بُرُوْقٍ وَّصَوَاعِقَ قَالَ فَاَتَيْتُ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنِهِمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ قُلْتُ يَاجِبْرِيْلَ مِنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ اَكِلَةُ الرِّبَاءِ رَوَاهُ اَحْمَدُ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ وَابْنِ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا وَالْاِصْبَهَانِىُّ اَيْضًا مِنْ طَوْرِيْقِ اَبِىْ هٰرُوْنَ الْعَبْدِىِّ وَاسْمُهٗ عَمَّارَةُبْنُ جُوَيْنٍ وَهُوَرَوَاهُ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا عَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ نَظَرَ فِى السَّمَاءِ الدُّنيا فَاِذَا رِجَالٌ بُطُوْنُهُمْ كَاَمْثَالِ الْبُيُوْتِ الْعِظَامِ قَدْمَالَتْ بُطُوْنُهُمْ وَهُمْ مُنَضَّدُوْنَ عَلٰى سَابِلَةِ اٰلِ فِرْعَوْنَ يُوْقَفُوْنَ عَلَى النَّارِ كُلَّ غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَا تَقُمِ السَّاعَةَ اَبَدًا قُلْتُ يَاجِبْرِئِلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ اَكَلَةُ الرِّبَا مِنْ اُمَّتِكَ لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ قَالَ الْاِصْبَهَانِىُّ قَوْلُهُ (مُنَضَّدُوْنَ) اَىْ طَرَحَ بَعْضٌ وَالسَّابِلَةُ الْمَارَّةُ اَىْ يَتَوَطَّوْهُمْ اٰلُ فِرْعَوْنَ الَّذِيْنَ يُعْرِضُوْنَ عَلٰى غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ اِنْتَهٰى-

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– মেরাজের রাতে আমি যখন সপ্তম আকাশে পৌছে উপরের দিকে তাকাই, তখন বজ্রের আওয়াজ, চমক এবং বজ্রপাত দেখতে পাই। তারপর বলেন, আমি এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের পেট ঘরের মতো (বড় বড়) ছিল। তাতে সাপ ভর্তি ছিল। যা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ.)কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল জবাবে বলেন– এরা সুদখোর। আল্লামা ইস্পাহানী (রহ.) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনীতে প্রথম আকাশে এমন লোকদেরকে দেখেছেন যাদের পেট ঘরের মত ফুলে ফেঁপে আছে এবং ঝুলে পড়েছে। ফেরাউনের

দলবলের চলার রাস্তায় এদেরকে স্তূপাকারে একের উপর একেকে ফেলে রাখা হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় ফেরাউনের দলবলকে যখন জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন এরা রাস্তায় পড়ে থাকা লোকদেরকে পায়ের তলায় পিষে অতিক্রম করতে থাকে। এরা আল্লাহর দরবারে দুআ করতে থাকে– হে আল্লাহ! কিয়ামত কখনও প্রতিষ্ঠা করো না। (কেননা ওরা জানে, কিয়ামতের দিন ওদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল জবাবে বলেন– এরা আপনার উম্মতের সুদখোর। যারা (কিয়ামতের দিন) এমনভাবে দাঁড়াবে যেন, শয়তান তাদেরকে মন্ত্রগ্রস্ত করে দিয়েছে।

২২.

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا وَالزِّنَا وَالْخَمْرُرَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيْحِ-

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– কিয়ামত নিকটবর্তী হলে সুদ, ব্যভিচার এবং মদ্যপান বেড়ে যাবে। [বিশুদ্ধ সনদে বাইহাকী]

২৩.

وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْوَرَّاقِ قَالَ رَاَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا فِى السُّوْقِ فِى الصَّيَارِ فَةِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الصَّيَارِفَةِ

اَلْبِشْرُوْا قَالُوْا بَشَّرَكَ اللهُ بِالْجَنَّةِ بِمَ تُبَشِّرُنَا يَا اَبَا
مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَلْبِشْرُوْا بِالنَّارِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ بِاِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهٖ-

অর্থাৎ হযরত কাসিম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল ওয়াররাফ বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.)কে সায়াফিয়ার বাজারে দেখতে পেলাম। তিনি ঘোষণা করেন– হে সায়ারিফাবাসী! সুসংবাদ শোন! তারা বললো, হে আবু মুহাম্মদ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে জান্নাত দান করে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন। আপনি আমাদেরকে কিসের সুসংবাদ শোনাতে চান? হযরত আবদুল্লাহ বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য দোযখের সুসংবাদ! (তোমরা দোযখের জন্য তৈরি হও) কেননা, সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ে বাকী লেনদেন বৈধ নয়। আর সায়ারিফার লোকেরা সাধারণত হিসাবের খাতায় বাকী লেনদেনের হিসাব লেখে। আর এটা সুদ। [তাবারানী]

২৪.

رَوِىَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكَ
وَالذُّنُوْبَ الَّتِىْ لَا تُغْفَرُ الْغُلُوْلَ فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا اَتَى
بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَكْلَ الرِّبَا فَمَنْ اكل اَكْلَ الرِّبَا
بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُوْنًا يَتَخَبَّطُ ثُمَّ قَرَاءَ- اَلَّذِيْنَ
يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ
وَالْاِصْبَهَانِىُّ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ وَلَفْظُهُ قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِىْ اٰكِلُ الرِّبَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مُخَبِّلًا يَجُرُّ شَفَتَهٗ ثُمَّ قَرَاَ لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا
كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ قَالَ
الْاِصْبَهَانِىُّ الْمُخَبِّلُ الْمَجْنُوْنُ-

অর্থাৎ হযরত আউফ ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমরা ঐসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, যা ক্ষমা করা হয় না। এক. গনীমতের মাল চুরি করা। যে ব্যক্তি গনীমতের মাল থেকে খেয়ানত করে কোন জিনিস নিয়ে নিল কেয়ামতের দিন ঐ জিনিস তার থেকে চাওয়া হবে। দুই. সুদ খাওয়া থেকে বাঁচ। কেননা সুদখোরকে কিয়ামতের দিন উন্মাদ এবং বেহুশ করে ওঠানো হবে। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন– যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিন শয়তানের মন্ত্রগ্রস্ত উন্মাদপ্রায় হয়ে উত্থিত হবে। তাবারানী এবং ইস্পাহানী হাদীসটি হযরত আনাস (রা.) থেকে প্রায় হুবহু বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– কিয়ামতের দিন সুদখোর তার ঠোঁট টেনে হেঁচড়ে নিয়ে হাজির হবে। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইস্পাহানী বলেন– 'মুখাব্বল' অর্থ পাগল।

২৫.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنَ
الرِّبَا اِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهٖ اِلٰى قِلَّةٍ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ
وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ وَفِىْ لَفْظٍ لَهٗ قَالَ

الرِّبَا وَ اِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهُ اِلَى قُلٍّ وَقَالَ فِيْهِ اَيْضًا صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ-

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি সুদের মাধ্যমে বেশি সম্পদ কামাই করেছে, পরিণতিতে তা কমে যাবে। [ইবনে মাজাহ, হাকিম]

ফায়দা : ইমাম আবদুর রাজ্জাক মামার থেকে বর্ণনা করেন, মামার বলেছেন– আমরা শুনেছি যে, সুদী সম্পদে চল্লিশ বছর অতিক্রম না করতেই বিভিন্ন বালা-মুসীবতের শিকার হয়ে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৬.

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا اٰكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَاْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهٖ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاخْتُلِفَ فِىْ سِمَاعِهٖ وَالْجُمْهُوْرُ عَلَى اَنَّهٗ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ-

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– সামনে এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউ চেষ্টা করে যদিও সুদ থেকে বেঁচে যাবে কিন্তু (সুদের ঝড়ের) ধুলোবালি অবশ্যই তার গায়ে লাগবে। [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

ফায়দা : এখানে একটি বিষয় চিন্তার দাবী রাখে, হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ সুদের প্রচলন এত সর্বব্যাপী হয়েছে যে, বড় বড় মুত্তাকী লোকও সুদের হাওয়া-বাতাস বা কোন না কোন শ্রেণীর সুদ থেকে বাঁচতে

পারছেন না। কিন্তু যে সুদ এ পরিমাণ প্রসার লাভ করেছে তা ব্যবসায়ী সুদ। এটা ঋণের সুদ বা প্রসিদ্ধ সুদ নয়। এ থেকে বুঝা যায় ব্যবসায়ী সুদও হারাম।

২৭.

وَرُوِىَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيَبِيْتَنَّ اُنَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى اَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَاَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيْرَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ فِىْ زَوَائِدِهٖ -

অর্থাৎ হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জান! আমার উম্মতের কিছু লোক গর্ব ও অহংকার এবং খেল-তামাশায় রাত কাটাবে। তারা সকাল হলে বানর আর শূকর হয়ে যাবে। কেননা তারা হারামকে হালাল করে নিয়েছিল। গায়িকা নাচিয়েছিল, মদপান করে উন্মাদ হয়েছিল, সুদ খেয়েছিল আর রেশম কাপড়ের লেবাস পরিধান করেছিল। [যাওয়াইদ]

২৮.

وَرُوِىَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبِيْتُ قَوْمٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى طَعْمٍ وَشُرْبٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوْا قَدْ مُسِخُوْا قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ وَلَيُصِيْبَنَّهُمْ خَسْفٌ وَّقَذْفٌ

حَتّٰى يُصْبِحَ النَّاسُ فَيَقُوْلُوْنَ خُسِفَ اللَّيْلَةَ بِبَنِىْ فُلَانٍ وَخُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارِ فُلَانٍ وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَآءِ كَمَا اُرْسِلَتْ عَلٰى قَوْمِ لُوْطٍ عَلٰى قَبَائِلَ فِيْهَا وَعَلٰى دُوْرٍ وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيْحُ الْعَقِيْمُ الَّتِىْ اَهْلَكَتْ عَادًا عَلٰى قَبَائِلَ فِيْهَا وَعَلٰى دُوْرٍ بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيْرَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَاَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَخَصْلَةٍ لسيها جعفر رَوَاهُ اَحْمَدُ مُخْتَصَرًا وَالْبَيْهَقِىْ وَاللَّفْظُ لَهٗ -

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– এ উম্মতের একদল লোক খাওয়া-দাওয়া এবং খেল-তামাশায় রাত কাটিয়ে দেবে। সকালে উঠে দেখবে যে তারা বানর ও শূকরের আকৃতি ধারণ করে ফেলেছে। আর এ উম্মতের অনেক লোক ভূমিধসের শিকার হবে এবং তাদের প্রতি নিশ্চিতই আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করা হবে। সকালে লোকেরা ঘুম থেকে জেগে বলাবলি করবে, আজ রাতে অমুক গোত্রের লোক ভূমিধসে মারা গিয়েছে বা অমুকের ঘরবাড়ি ধসে গিয়েছে। আর তাদের প্রতি পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে। যেমন লূত জাতির প্রতি বর্ষানো হয়েছিল। ঐ গোত্রে শক্তিশালী ঝড়-তুফান পাঠানো হবে। তাদের ঘরবাড়ি এবং তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের প্রতি ভূমিধস এবং পাথর বর্ষানোর শাস্তি এ জন্য দেয়া হবে যে, তারা মদ পান করতো, রেশমী কাপড় পরিধান করতো, সুদ খেতো এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতো। আরও একটি অসদাচরণের জন্যও এ শাস্তি হবে। যা বর্ণনাকারী (জাফর) ভুলে গিয়েছেন।

(ইমাম আহমদ হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।) [বাইহাকী]

২৯.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ رَوَاهُ النَّسَائِىُّ -

অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদী কারবারের লেখক এবং যাকাত বর্জনকারীদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। আর সজোরে ক্রন্দন করতে তিনি নিষেধ করেছেন। [নাসাঈ]

৩০.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اٰخِرَ مَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الرِّبٰوا وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىْ -

অর্থাৎ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন– মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সর্বশেষ যে আয়াত অবতীর্ণ হয় তা সুদ সম্পর্কিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুরো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি, তার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। সুতরাং সুদ ছেড়ে দাও আর যার ভেতর সুদের সামান্য গন্ধও আছে তাও ছেড়ে দাও। [ইবনে মাজাহ, দারমী]

ফায়দা : পুস্তিকার শুরুতে হযরত উমর (রা.)-এর এ উক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, হযরত উমর (রা.)-এর এই বক্তব্য সুদের তৎকালীন প্রসিদ্ধ প্রকারের সুদ সম্পর্কে নয়; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত ব্যবসায়ী সুদ সম্পর্কে। অর্থাৎ ছয়টি পণ্যের পরস্পর বেচাকেনায় কম বেশি করা বা বাকীতে লেনদেন করাকে সুদ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন পরবর্তী ৩১, ৩২, ৩৩ নং হাদীসে আলোচনা আসছে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, এ ছয়টি পণ্যের বিধান অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না? যদি প্রযোজ্য হয় তবে তার মূলনীতি কী?

আর রিবা বা সুদের প্রসিদ্ধ প্রকার যা কুরআন নাযিলের পূর্ব থেকেই আরবে প্রচলিত ছিল সেটা সুদ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। হযরত উমর (রা.) বা অন্য কোন সাহাবা (রা.) সে ব্যাপারে কোন ধরনের সংশয়ে ছিলেন না। সর্বসম্মতভাবেই তা সুদ এবং হারাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

৩১.

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تَشُفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تَشُفُّوْا ابَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوْامِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِزٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে শুধু এভাবে বিক্রি কর যেন উভয়ই সমান সমান হয়। কম দিয়ে বেশি বা বেশি দিয়ে কম নিও না। ঠিক তেমনি রূপা, লেনদেন সমান সমান কর। কম বেশি করো না। দেয়াটা নগদ নেয়াটা বাকী বা

নেয়াটা নগদ দেয়াটা বাকী অর্থাৎ বাকীতে এসব লেনদেন করো না। [বুখারী, মুসলিম]

৩২.

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدُوْرِىْ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوِسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبَى اَلْاٰخِذُ وَالْمُعْطِىْ فِيْهِ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যব বা বার্লির বিনিময়ে যব বা বার্লি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ বেচাকেনা করার সময় বেশ কম না করে একদম সমান সমান এবং নগদ নগদ করা উচিত। কেউ যদি বেশি দেয় বা বেশি চায় সে সুদী কারবার করলো। দানকারী ও গ্রহণকারী গুনাহর ক্ষেত্রে সমান। [মুসলিম]

৩৩.

عَنْ عُبَادَةَ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

অর্থাৎ হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যব বা বার্লির বিনিময়ে যব বা বার্লি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, বেচাকেনা করার সময় কম বেশি না করে একেবারে সমান সমান এবং নগদ নগদ করা উচিত। আর পণ্য যখন ভিন্ন ভিন্ন হবে, অর্থাৎ গম দিয়ে খেজুর ক্রয় করা হবে তখন তোমরা যেমন ইচ্ছা বেশ কম করে বেচাকেনা করতে পার। কিন্তু এই ধরনের বেচাকেনাও নগদ নগদ হতে হবে। [মুসলিম]

৩৪.

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارٰى أَنَّ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ -

অর্থাৎ ইমাম শায়বী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের খৃষ্টান অধিবাসীকে একটি ফরমান লিখে পাঠান। তাতে লেখা ছিল– তোমাদের কেউ যদি সুদী কারবারের সাথে জড়িত থাকে তবে সে করদাতা (ذِمِّى) নাগরিক হয়েও আমাদের কাছে থাকতে পারবে না। [কানযুল উম্মাল]

এ থেকে বুঝা যায়, ইসলামে সুদের বিধান দেশের সব নাগরিকের জন্য অবশ্য পালনীয় ছিল।

৩৫.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَا سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ

فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً -

অর্থাৎ হযরত বারা ইবনে আযীব (রা.) ও যায়দ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন– আমরা ব্যবসায়ী ছিলাম। আমরা আমাদের ব্যবসা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যদি লেনদেন নগদ নগদ হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। আর বাকীতে এ ব্যবসা বৈধ নয়। [কানযুল উম্মাল]

প্রশ্নটি দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পণ্য কম বেশি করে বেচাকেনা করার ব্যাপারে ছিল। যেমন অন্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায়।

৩৬.

عَنْ اِمْرَأَةِ أَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ بِعْتُ زَيْدَبْنِ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةٍ وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا بِئْسَ وَاللهِ مَااشْتَرَيْتِ أَبْلِغِىْ زَيْدَبْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوْبَ قَالَتْ أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِىْ قَالَتْ لَا بَأْسَ مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ -

অর্থাৎ হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী বলেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে প্রকৃত মাসআলা জানার জন্য বললাম– আমি হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-এর কাছে আমার এক দাসী বাকীতে আটশ' টাকায় বিক্রি করলাম। তারপর আবার আমি তার

কাছ থেকে ছয়শ' টাকায় কিনে নিই। (ফল হলো, ছয়শ' টাকা ধার দিয়ে নির্ধারিত সময়ে আটশ' টাকার মালিক বনে গেল। দুইশ' টাকা লাভ হয়ে গেল।) এটা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– আল্লাহর কসম! তুমি খুব নিকৃষ্ট লেনদেন করেছো। যায়দ ইবনে আরকামকে আমার পয়গাম পৌছে দাও যে, তুমি এ (সুদী) কারবার করে তোমার জিহাদকে নিষ্ফল করে দিয়েছ। যেসব জিহাদ তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে করেছ সবই নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে। হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী আবেদন করলেন– আমি যদি শুধু আমার মূল টাকা অর্থাৎ ছয়শ' টাকা রেখে বাকী টাকা ছেড়ে দিই তাহলে কি গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবো?

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– হ্যাঁ, যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ পৌছে যায় এবং সে তার গুনাহ থেকে ফিরে আসে, তখন তার পেছনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কুরআন মজীদে এর মীমাংসা রয়েছে– যে সুদী কারবার করে ফেলেছে সে শুধু মূল টাকাই পাবে। বাড়তিটা সে পাবে না। [কানযুল উম্মাল]

৩৭.

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ اِنِّى اَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا فَاَهْدٰى لِىْ هَدِيَّةً قَالَ ثَبِّهْ مَكَانَهُ هَدِيَّةً اَوْاَحْسِبْهَالَهُ مِمَّا عَلَيْهِ -

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বললো– আমি একজনকে ঋণ দিয়েছি। সে আমাকে একটি উপহার দিয়েছে। তা কি আমার জন্য হালাল হবে? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন– হয়তো তার উপহারের প্রতিদানস্বরূপ তুমিও তাকে কোন উপহার দিয়ে দাও বা ঋণের টাকা

থেকে বাদ দিয়ে দাও। (কারণ, হতে পারে যে, সে ঋণের প্রতিদানস্বরূপ এ উপহার দিয়েছে)। [কানযুল উম্মাল]

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, সুদ দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে দাতা-গ্রহীতা উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তা আদান প্রদান করলেও সুদ বৈধতা পায় না। সুদ সর্বাবস্থায় হারাম।

৩৮.

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلْهُ اَوْ حَمَلَهُ عَلٰى دَابَّتِهٖ فَلَا يَرْكَبْهَا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ - اِبْنُ مَاجَةَ بَابُ الْقَرْضِ وَسُنَنُ بَيْهَقِىْ-

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) বলেন– যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে ঋণ দেয় এবং ঋণগ্রহীতা কোন ধরনের খানা বা অন্য কোন হাদিয়া ঋণদাতাকে প্রদান করে, তাহলে তার হাদিয়া গ্রহণ করবে না বা যদি সে কোন বাহনে ঋণদাতাকে চড়াতে চায় তাহলে সে তা প্রত্যাখ্যান করবে। তবে এ ধরনের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ঋণ নেয়ার আগেও যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের জন্য এমন করাতে কোন অসুবিধা নেই। (তখন বুঝা যাবে যে, এ হাদিয়া ঋণের কারণে নয়।)

৩৯.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَهْدٰى اِلٰى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مِنْ ثَمَرَةِ اَرْضِهٖ فَرَدَّهَا فَقَالَ اُبَىْ لِمَ رَدَدْتَّ هَدِيَّتِىْ وَقَدْ عَلِمْتَ اَنِّىْ مِنْ اَطْيَبِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ثَمَرَةً

خُذْعَنِّىْ مَا تَرُدُّ عَلٰى هَدِيَّتِىْ وَكَانَ عُمَرُ رَضِ اَسْلَفَهٗ عَشَرَةُ الاَفِ دِرْهَمٍ -

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেন- হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর কাছে নিজের বাগানের ফল হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.) তা ফেরত পাঠিয়ে দেন। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি জানেন, আমার বাগানের ফল পুরো মদীনার মধ্যে সর্বোত্তম ফল। তারপরও আপনি কেন তা ফেরত পাঠালেন? আপনি এটা গ্রহণ করুন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, উমর (রা.) হযরত কাব (রা.)কে দশ হাজার দিরহাম ঋণ দিয়েছিলেন। [কানযুল উম্মাল] তাঁর ভয় ছিল, এ হাদিয়া আবার ঐ ঋণের বিনিময় হয়ে যায় কি না। পরে হযরত কাবের হাদিয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং তাঁর আগেকার হাদিয়া প্রদানের কথা বিবেচনা করে হযরত উমর (রা.) তা গ্রহণ করেন। এর আগে হযরত আনাস (রা.)-এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে পূর্ব থেকে হাদিয়া আদান-প্রদানের পরিবেশ থাকলে ঋণদাতা হাদিয়া গ্রহণ করতে পারেন বলে বলা হয়েছে। এমনকি হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) নিজেও এ মাসআলাতে এ মতই পোষণ করতেন। সামনের হাদীসেই তা বর্ণিত হয়েছে।

৪০.

وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا اَقْرَضْتَ رَجُلًا قَرْضًا فَاَهْدٰى لَكَ هَدِيَّةً فَخُذْقَرْضَكَ وَارْدُدْ اِلَيْهِ هَدِيَّتَهٗ -

অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন তুমি কাউকে ঋণ দিবে এবং তারপর যদি

সে তোমাকে কোন উপহার দেয়, তাহলে তুমি উপহার ফেরত দিয়ে তোমার ঋণ তুমি নিয়ে নাও। [কানযুল উম্মাল]

৪১.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا اَسْلَفْتَ رَجُلًا سَلَفًا فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةً كَرَاعٍ اَوْعَارِيَةِ رَكُوْبِ دَابَّةٍ -

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- তুমি যখন কাউকে ঋণ দিবে তখন তার থেকে উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করবে না এবং তার থেকে তার বাহন ধার হিসেবে নিয়ে ব্যবহার করবে না। [কানযুল উম্মাল]

৪২.

عَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِ عَلِىٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا ذَ كَرَهٗ فِى الْكَنْزِ بِرَمْزِحَارِثِ بْنِ اَبِىْ اُسَامَةَ فِىْ مُسْنَدِ مِثْلِهٖ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَتَكَلَّمَ عَلٰى اِسْنَادِهٖ فِىْ فَيْضِ الْقَدِيْرِ وَلٰكِنَّ شَارِحَهُ الْعَزِيْزِىْ قَالَ فِى السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ قَالَ الشَّيْخُ حَدِيْثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ -

অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ঋণ কোন (পার্থিব) লাভ সৃষ্টি করে তা রিবা।

৪৩.

اِذَا اَرَادَاللّٰهُ بِقَوْمٍ هَلَاكًا فَشٰى فِيْهِمُ الرِّبَا فَرُوِىَ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ـ

অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আল্লাহ্ তাআলা যখন চান কোন জাতিকে ধ্বংস করবেন তখন সে জাতির মধ্যে সুদী কারবার প্রসার লাভ করে।

৪৪.

عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَاوَلَأَنْ أَكُوْنَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِىْ مِصْرُ وَكُوْرُهَا وَأَنَّ مِنْهُ أَبْوَابٌ بَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍمِنْهَا السَّلَمُ فِى السِّنِّ وَأَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِىَ مُعَصْفَةٌ لِمَا تَطِبْ وَأَنْ يُّبَاعَ الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ نِسَاءٍ ـ

অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণে তিনি বলেন– তোমরা মনে করেছ যে, আমরা 'রিবা' বা সুদের প্রসারিত শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে অবগত নই। তোমরা জেনে রাখ, রিবা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা আমার কাছে মিশর সাম্রাজ্য করায়ত্ব করার চাইতে আরো প্রিয়। (এর অর্থ এই নয়, সুদের বিস্তারিত ব্যাপারটি অস্পষ্ট। কেননা, সুদের অনেক প্রকার কারো কাছে অস্পষ্ট নয়।) সুদের এক প্রকার হলো, জন্তু বেচাকেনায় 'সলম'[১] পদ্ধতি অবলম্বন করা। আরেক প্রকার হলো ফল পাকার আগে কাঁচা থাকতে বিক্রি করা। আরেক প্রকার হলো স্বর্ণকে রূপার বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করা। [কানযুল উম্মাল]

[১]. পণ্যের মূল্য আগে দিয়ে বাকীতে পণ্য হস্তান্তর করাকে সলম বিক্রি বলে।

৪৫.

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرِّبَوا ـ

অর্থাৎ হযরত শাবী (রা.) বলেন– হযরত উমর (রা.) বলেছেন– আমরা শতকরা নব্বই ভাগ হালাল কারবারকে সুদ হওয়ার ভয়ে ছেড়ে দিয়েছি। [কানযুল উম্মাল]

এ হাদীস এবং এর আগের হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত উমর (রা.) যে বলেছেন, সুদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা এতটুকু সময় পাইনি যে, সুদের পুরো ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে জেনে নেব। এর অর্থ এই নয় যে, সুদের ব্যাখ্যা আরববাসীদের কাছে অস্পষ্ট ছিল। বরং হযরত উমর (রা.)-এর কথার মর্ম হলো– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব নতুন ব্যাপার রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন সে ব্যাপারে কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছিল। ঋণের উপর লাভ নেয়ার সুদের ব্যাপারে কোন ধরনের অস্পষ্টতা বা কোন ধরনের সন্দেহ সংশয় ছিল না।

৪৬.

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَئَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُوْنُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُوْلُ عَجِّلْ لِىْ وَأَنَا أَضَعُ عَنْكَ لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ وَإِنَّمَا الرِّبَا أَخِّرْلِىْ وَأَنَا أَزِيْدُكَ وَلَيْسَ عَجِّلْ لِىْ وَأَنَا أَضَعُ لَكَ ـ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, এক ব্যক্তি অন্য এক লোককে নির্ধারিত একটা সময়ের জন্য ঋণ দিয়েছিল। এখন ঋণদাতা গ্রহীতাকে নির্ধারিত সময়ের আগেই বললো, তুমি এখনই যদি আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও তবে তোমাকে টাকার একটা অংশ

ছেড়ে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন– এতে কোন অসুবিধা নেই। সুদ তো হলো, কেউ বললো যে– তোমার ঋণের টাকায় আগে কিছু সময় বাড়িয়ে দাও, আমিও বাড়তি কিছু টাকা তোমাকে দিয়ে দেব। এটা সুদ নয় যে, তুমি ঋণের টাকা সময়ের আগে পরিশোধ করলে আর ঋণদাতা কিছু ছাড় দিয়ে দিল। এটা বৈধ। [ইবনে আবি শায়বার বরাতে কানযুল উম্মাল]

৪৭.

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَا تُشَارِكْ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوْسِيًّا قِيْلَ وَلِمَ قَالَ لِاَنَّهُمْ يُرْبُوْنَ وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ -

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– কোন ইহুদী খৃষ্টান বা অগ্নিপূজকের সাথে শেয়ারে ব্যবসা করো না। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন– এরা সুদী কারবার করে। আর সুদ হালাল নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সুদখোরদের সাথে শেয়ারে ব্যবসা করাও হারাম।

আমার ইচ্ছা ছিল সুদের অবৈধতা সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করবো। লিখতে লিখতে চল্লিশ পার হয়ে গেল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী কুরআন মজীদের তাফসীর। তাঁর এসব বাণীর প্রতি যে ব্যক্তি আমানতদারীর সাথে দৃষ্টি দিবে তার সামনে থেকে সব সন্দেহ-সংশয়ের পাহাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং দিবালোকের মত সত্য ফুটে উঠবে। আজকাল সুদকে বৈধতা দেয়ার জন্য যে সব মাসআলা উপস্থাপন করা হয়, পুস্তিকার শুরুতে তার জবাব দেয়া হয়েছে।

সুদ নামক এ পুস্তিকার দ্বিতীয় অধ্যায় মাওলানা তকী উসমানী রচনা করেছেন। (বান্দা মো. শফী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরীয়ত ও যুক্তির আলোকে ব্যবসায়ী সুদ

শায়খুল ইসলাম তকী উসমানী
সহকারী পরিচালক, দারুল উলূম করাচী।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

অনেক দিন হলো, পাকিস্তানের প্রধান অডিটর জনাব ইয়াকুব শাহ সাহেব 'সুদের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা' নামে একটি প্রশ্নপত্র রচনা করেন। যা তিনি অনেক উলামায়ে কিরামের কাছে প্রেরণ করেন। তার সবগুলো প্রশ্নই ব্যবসায়ী সুদের ব্যাপারে। এ সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনা ও চিন্তা গবেষণার পর তিনি তার সারাংশ ঐ প্রশ্নপত্রে লিখে পাঠান। যেসব কারণে তিনি মনে করেন যে, ব্যবসায়ী সুদ হালাল হওয়া উচিত।

এ প্রশ্নপত্রের একটা কপি আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.)-এর কাছেও আসে। অনেক দিন পর্যন্ত এ প্রশ্নপত্রটি আব্বার কাছে পড়ে থাকে। বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন এ সম্পর্কে কিছু লিখতে পারেননি। এর কিছুদিন পর মাহিরুল কাদিরী (সম্পাদক- ফারান, করাচী) একই বিষয়ের আরেকটি পুস্তক আব্বাজানের মতামত জানার জন্য পাঠান। সে পুস্তকটি লিখেছেন- জনাব মুহাম্মদ জাফর শাহ সাহেব ফুলওয়ারবী, সদস্য, ইদারায়ে সাকাফতে ইসলামিয়া। পুস্তকের একটি অধ্যায় ছিল বিভিন্ন প্রশ্নে ভরপুর। সেসব প্রশ্নের জবাবে জনাব জাফর শাহ সাহেব ব্যবসায়ী সুদ সম্পর্কে ফেকহী পর্যালোচনা করেন এবং এটা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন যে, ব্যবসায়ী সুদ হারাম নয়।

এ পুস্তকও অনেক দিন পর্যন্ত আব্বাজানের কাছে পড়ে থাকে। ভীষণ ব্যস্ততার দরুন এর ব্যাপারেও কিছু লেখার সুযোগ পাননি। পরিশেষে তিনি এ দুটো লেখা আমার হাতে দিয়ে নির্দেশ দেন যে, এ ব্যাপারে কিছু লেখ। জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও নির্দেশ পালনার্থে অধম নিজের যোগ্যতা মোতাবেক চিন্তা-ফিকির ও গবেষণা করে কিছু লিখে দিলাম। এরপর তিনি আমার লেখাকে সম্পাদনা করেন, যা এখন আপনাদের সামনে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার, আজকাল দুনিয়াতে দুই ধরনের সুদ প্রচলিত আছে।

১. মহাজনী সুদ, যা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সাময়িক অসুবিধা দূর করার জন্য নেয়া ঋণের (USURY) উপর উসল করা হয়।

২. ব্যবসায়ী সুদ, যা কোন লাভজনক (Productive) কাজের জন্য নেয়া ঋণের উপর উসল করা হয়।

কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি এবং উম্মতের ঐকমত্য (إجماع أمة) সুদের প্রত্যেকটি প্রকার এবং তার সব শাখা-প্রশাখাকে নিকৃষ্ট হারাম ঘোষণা করেছে। প্রথম প্রকার সুদকে তো যারা দ্বিতীয় প্রকারকে বৈধ বলেন তারাও হারাম বলে থাকেন।

জনাব ইয়াকুব শাহ সাহেব এবং মোহাম্মদ জাফর শাহ সাহেব ফুলওয়ারবীদের যে ধরনের সুদের ব্যাপারে সন্দেহ তা দ্বিতীয় প্রকারের সুদ। ব্যবসায়ী সুদ। তাই আমি আমার এ লেখায় ব্যবসায়ী সুদের ব্যাপারেই আলোচনা করবো। মহাজনী সুদ আমার আলোচ্য নয়। ব্যবসায়ী সুদকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য যেসব দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, আমি সেসব নিয়ে পর্যালোচনা করবো। (আল্লাহই একমাত্র সহায়)।

২৬ আগস্ট ১৯৬১ ইং **(মুহাম্মদ তকী উসমানী)**
৮৭১ গার্ডেন ইস্ট, করাচী

ফেকাহশাস্ত্রের দলিল

প্রথমে আমরা ঐসব দলিল-প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করবো যা ব্যবসায়ী সুদকে বৈধ ঘোষণাকারীরা ইসলামী আইনের আলোকে উপস্থাপন করেছে। এদের দুটো গ্রুপ আছে। এক গ্রুপ তাদের প্রমাণের ভিত্তি স্থাপন করেছে এ সিদ্ধান্তের উপর যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ব্যবসায়ী সুদ প্রচলিত ছিল কি না? তাদের বক্তব্য হলো, কুরআনে হারাম সুদের জন্য 'রিবা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার মর্মার্থ, সুদের বিশেষ ঐ প্রকার যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে বা তার পূর্বে জাহিলী যুগেও প্রচলিত ছিল। কুরআনে কারীমের সরাসরি শ্রোতা হলো আরববাসী। তাদের সামনে যখন রিবার আলোচনা করা হবে, তখন তার মর্মার্থ ঐ রিবা হবে যাকে তারা জানে। যার পরিচিতি তাদের সামনে স্পষ্ট। আমরা যখন সে যুগের প্রচলিত সুদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেব, তখন আমরা কোথাও ব্যবসায়ী সুদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাই না। ব্যবসায়ী সুদের সূচনা ঘটে ইউরোপে। তারাই এর আবিষ্কারক। শিল্প বিপ্লবের পর যখন শিল্প এবং ব্যবসায় উন্নতি ঘটে, তখন ব্যবসায়ী সুদ (Commercial interest) আদান প্রদান শুরু হয়। সুতরাং যেসব আয়াতের মাধ্যমে সুদের অবৈধতা অনুভূত হয়, সেসব আয়াত দিয়ে ব্যবসায়ী সুদের অবৈধতা প্রমাণ করা অযৌক্তিক হবে।

আমরা প্রথমে তাদের দলিল-প্রমাণের সার্বিক দিক পর্যালোচনা করবো।

আমাদের দৃষ্টিতে তাঁদের এ প্রমাণ প্রক্রিয়া একদম ভাসা ভাসা। দুর্বল ভিত্তের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা তাঁরা তাদের দলিল-প্রমাণের ইমারত দুটো স্তম্ভের উপর দাঁড় করিয়েছে।

এক. রিবার মর্মার্থ হলো, রিবার ঐ প্রকার যা নববী যুগে প্রচলিত ছিল।

দুই. ব্যবসায়ী সুদ তখন প্রচলিত ছিল না।

এ দুটি খুটি বা স্তম্ভকে একটু টোকা দিয়ে দেখুন, সহজেই বোঝা যাবে যে, একেবারেই অন্তঃসারশূন্য। বাইরে ফাঁপানো, ভেতরে খালি।

প্রথমত এ কথাটাই একটা হালকা কথা যে, রিবার যে আকার প্রকার জাহিলী যুগে প্রচলিত না হবে তা হারাম নয়। কেননা ইসলাম কোন বিষয়কে হারাম বা হালাল ঘোষণা দেয়ার সময় তার একটি কারণ থাকে। আর ঐ কারণের উপরই বিধান নির্ণয় নির্ভর করে। কারণই নির্ণয় করবে যে, এটা হালাল না হারাম। আকার প্রকার পরিবর্তনের কারণে বিধানে কোন ধরনের তারতম্য হয় না। কুরআন হাকীম (والخمر) মদকে হারাম ঘোষণা করেছে। নববী যুগে তা যে আকার আকৃতিতে প্রসিদ্ধ ছিল এবং তা তৈরি করার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তার সবই বদলে গিয়েছে। কিন্তু যেহেতু মূল ব্যাপারটি বদলায়নি, তাই তার বিধানও বদলায়নি। মদ দস্তুরমতো হারামই রয়ে গিয়েছে। (الفحشاء) 'ব্যভিচার'-এর আকার বা ধরন সে যুগে অন্য রকম ছিল। আর আজ তা অন্য আকার ধারণ করেছে। আকাশ পাতালের পার্থক্য। কিন্তু ব্যভিচার ব্যভিচারই রয়ে গিয়েছে। সুতরাং কুরআনের সেই একই বিধান প্রযোজ্য হবে। সুদ এবং জুয়ারও একই অবস্থা। সে যুগে তার যে পদ্ধতি ছিল, আজ তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু যেমন মেশিন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত মদও মদ নামে পরিচিত। সিনেমা আর ক্লাবের মাধ্যমে সৃষ্ট বেলাল্লাপনা এবং ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট ব্যভিচার ঐ ব্যভিচারই। তাহলে সুদ এবং জুয়াকে নতুন আকৃতি দিয়ে ব্যাংকিং বা লটারী নাম দিয়ে দেয়া হলে তা কেন বৈধ হয়ে যাবে? কেন মূল ব্যাপার এক হওয়া সত্ত্বেও তার বিধান পরিবর্তিত হবে? এটা তো তেমনি, যেমন এক হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ আরবী গ্রাম্য এক লোকের (বিশ্রী কণ্ঠের) গান শুনে বলেছিল যে, জীবন উৎসর্গ হোক নবীজীর প্রতি। তিনি তো এদের গান শুনেছিলেন, তাই গান অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন। আর আমিও বলি এ গান হারামই হওয়া উচিত। যদি নবীজী আমাদের (সুললিত কণ্ঠের) গান শুনতেন তাহলে কখনও হারাম বলতেন না। (নাউযুবিল্লাহ) কুরআন যে সুদের অবৈধতার ঘোষণা দিয়েছে তাকে 'দারিদ্র্যতা বশত সুদ' এবং 'বিপদাপদ বশত সুদ'-এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করার অপচেষ্টা– এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

নববী যুগে কি ব্যবসায়ী সুদ প্রচলিত ছিল না

তাদের দলিলের দ্বিতীয় ভিত্তিও সঠিক নয়। তারা বলেছে– জাহিলী যুগে ব্যবসায়ী সুদ (Commercial intarest) প্রচলিত ছিল না। এটা বলা ইতিহাস এবং হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রাক ইসলামী যুগ এবং ইসলামী যুগের ইতিহাসে একটু দৃষ্টি দিলেই এ বিষয়টি দিবালোকের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে যে, সে যুগে সুদী লেনদেন শুধু অভাব বা বিপদকালীন ঋণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; রবং ব্যবসায়ী এবং লাভজনক উদ্দেশ্যেও ঋণ লেনদেন হতো। একটু দৃষ্টি দেয়া যাক নীচের এ বর্ণনাগুলোর দিকে–

كَانَتْ بَنُوْ عَمْرِوبْنِ عَامِرٍ يَأْخُذُوْنَ الرِّبٰوا مِنْ بَنِىْ الْمُغِيْرَةِ- وَكَانَتْ بَنُو الْمُغِيْرَةِ يَرْبُوْنَ لَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَلَهُمْ عَلَيْهِمْ مَالٌ كَثِيْرٌ-

অর্থাৎ ইবনে জুরায়হ ও ইবনে জরীরের সূত্রে বর্ণিত, জাহিলী যুগে বনু আমর ইবনে আমির বনু মুগীরা থেকে সুদ গ্রহণ করতো। বনু মুগীরা তাদেরকে সুদ দিত। যখন ইসলাম আসলো তখন তাদের মধ্যে অনেক টাকার লেনদেন ছিল। [দুররে মানসুর : ১ : ৩৬৬]

হাদীসটিতে[১] দুটো গোত্রের মাঝে সুদী লেনদেনের আলোচনা করা হয়েছে। এটা মনে রাখতে হবে, এসব গোত্রের পারস্পরিক ব্যবসা আজকালকার ব্যবসায়ী কোম্পানীর মতই ছিল। এক গোত্রের[২] লোকেরা নিজেদের সম্পদ

---

[১]. তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান তার মৃত্যুর সময় তার সন্তানদেরকে ওসিয়ত করে বলল– বনু সাকীফের কাছে যে সুদের টাকা আমার প্রাপ্য আছে, তা অবশ্যই আদায় করবে। ছাড়বে না। [অনুবাদ- সীরাতে ইবনে হিশাম- ১ : ৪২০] এখানে ঋণগ্রহীতা একটা গোত্র। যে ব্যক্তিগত কারণে ঋণ নিতে পারে না। নিশ্চয়ই এটা রাষ্ট্রীয় ঋণের মত। [তকী উসমানী]

[২]. বদর যুদ্ধের কারণ হিসেবে ইতিহাসে যে ঘটনাটি স্থান পেয়েছে তাতে দেখা যায়– আবু সুফিয়ান (রা.) [কুফর অবস্থায়] একটি ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী তাতে মক্কার প্রত্যেকটি অংশীদার ছিল। আল্লামা যুরকানী (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ- শরহে মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়াতে লিখেছেন– لَمْ يَبْقَ قُرَشِىٌّ وَلَا قُرَشِيَّةٌ لَهُ مِثْقَالٌ إِلَّا بَعَثَ بِهِ فِى الْعِيْرِ অর্থাৎ কুরায়শী পুরুষ-নারী কেউ এমন ছিল না, যার কাছে একটি দিরহাম আছে অথচ সে তা ঐ ব্যবসায়ী কাফেলায় পাঠায়নি।

এক জায়গায় একত্রিত করে এক জোট হয়ে ব্যবসা করতো। অথচ এ গোত্র ভাল মালদার ছিল। এখন নিজেই ফায়সালা করুন, কোন দুই গোত্রের মাঝে সুদের ধারাবাহিক কারবার কি কোন বিপদকালীন প্রয়োজনের তাগাদায় হতে পারে? নিঃসন্দেহে এই লেনদেন ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছে।

এ দলিলের ব্যাপারে জনাব ইয়াকুব শাহ সাহেব 'মাসিক সাকাফতে' (ডিসেম্বর ১৯৬১) বলেন– এ ঋণ ব্যবসায়ী ছিল না। বরং এটা ছিল কৃষি ঋণ। এখানে তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে একটা হাদীসও উপস্থাপন করেছেন। আমার মতে, আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলার মাধ্যমে তাঁর দলিলের অসারতা প্রমাণিত হয়। আর যদি সে দলিলকে মেনেও নেয়া হয়, তবুও তাতে আলোচ্য বিধানে কোনই পার্থক্য সূচিত হবে না। কেননা, ঋণ চাই তা ব্যবসায়ী হোক বা কৃষি সংক্রান্ত হোক সর্বাবস্থায় তা লাভজনক ব্যাপার। যদি লাভজনক উদ্দেশ্যে কৃষি সুদ নাজায়েয হতে পারে তাহলে ব্যবসায়ী সুদের বৈধতার কারণ এটা ছাড়া আর কী হতে পারে যে, ইউরোপিয়ান মার্কেটে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ব্যবসায়ী সুদের। তাই এটাকে হালাল করে দেয়া উচিত। তারা বলেছেন– এ চিন্তাধারা আজকাল উন্নত কৃষিনীতির জন্য আদর্শ। যাতে বিভিন্ন ধরনের মেশিনপত্র এবং নবআবিস্কৃত পদ্ধতির ব্যাপারে জোর দেয়া হয়ে থাকে। অথচ প্রাচীনকালে কৃষক যে ঋণ নিত তার কারণ হতো দরিদ্রতা।

এটা একটা অবান্তর কথা, প্রাচীনকালেও অনেক কৃষক ধনী হতো এবং অনেক বিশাল আকারে কৃষি কাজ করতো। তারপর আবার এ হাদীসটিতে গোত্রের সম্মিলিত ঋণের কথা উদ্ধৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত ঋণ নয়, আমার বুঝে আসে না যে, পুরো গোত্রের ঋণকে কীভাবে দারিদ্র্যতার ঋণ বা আপদকালীন ঋণ বলে ঘোষণা দেয়া যেতে পারে?

একটি সুস্পষ্ট দলিল

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দুররে মানসুরে একটি হাদীস বর্ণনা করেন–

مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ-

যে ব্যক্তি মুখাবারা[১] না ছাড়বে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখুক। [আবু দাউদ, হাকিম]

এ হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারাকে এক ধরনের সুদ ঘোষণা করে তা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। যেভাবে সুদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন, তেমনি যে মুখাবারা করবে, তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

হাদীসটিকে দলিল হিসেবে বুঝার জন্য মুখাবারার ব্যাখ্যা বুঝে নিতে হবে।

'মুখাবারা' ভাগ-বাটোয়ারার একটি প্রকার। তাহলো, কোন জমির মালিক কোন কৃষককে এ চুক্তির ভিত্তিতে তার জমি দিল যে, কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের একটা নির্ধারিত পরিমাণ অংশ জমির মালিককে দিবে। ধরুন, আপনার একটা জমি আছে। আপনি জমিটি আবদুল্লাহকে এই চুক্তির ভিত্তিতে ফসল করার জন্য দিলেন যে, সে নির্ধারিত পরিমাণ যেমন- পাঁচ মণ প্রত্যেক ফসল থেকে আপনাকে দেবে। চাই তার ফসল কম হোক বা বেশি হোক বা একেবারেই না হোক। অথবা চুক্তি হলো যে, পানির নালার পাশের ফসলগুলো আমাকে দেবে বাকী সব তোমার। এ চুক্তিকে মুখাবারা বলে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চুক্তিকে রিবার একটি প্রকার ঘোষণা দিয়েছেন এবং বলেছেন, তা হারাম। এখন আপনিই চিন্তা করুন যে, এ চুক্তি রিবার কোন প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত– ব্যক্তিগত বিপদকালীন বা দারিদ্র্যকালীন সুদের সাথে না কি ব্যবসায়ী সুদের সাথে? এটা স্পষ্ট যে, এখানে যে মুখাবারার কথা বলা হয়েছে তা ব্যবসায়ী সুদের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যবসায়ী ঋণে যেমন ঋণগ্রহণকারী ঋণের টাকা কোন লাভজনক কাজে ব্যবহার করে, তেমনি মুখাবারাতে কৃষক জমিকে লাভজনক কাজে লাগায়। ব্যক্তিগত বিপদকালীন সুদে বা দরিদ্রকালীন সুদে এমন করা হয় না।

---

[১]. নির্ধারিত পরিমাণ ফসল দেয়ার চুক্তিতে জমি দেয়া নেয়া করা।

হারাম হওয়ার যে কারণ মুখাবারাকে অবৈধ ঘোষণা করে তা হলো- সম্ভাবনা আছে, ফসল হওয়ার পর মেপে দেখা গেল সব মিলে ৫ মণই উৎপন্ন হয়েছে। তখন তো কৃষক কিছুই পাবে না। একই কারণ ব্যবসায়ী সুদেও পাওয়া যায়। যেমন- সম্ভাবনা আছে, যে টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় খাটিয়েছে তা থেকে শুধু ততটুকু লাভই এসেছে যতটুকু তাকে সুদ হিসেবে দিয়ে দিতে হবে। অথবা তার চেয়েও কম লাভ হয়েছে। (এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে)। এই কারণ ব্যক্তি সুদের ভেতর পাওয়া যায় না। কেননা, ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা কোন ব্যবসায় খাটায় না। সেটা হারাম হওয়ার কারণ অন্যটা।

মোট কথা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারাকে রিবা বা সুদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মুখাবারা আপদকালীন নেয়া ঋণের সুদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এটা ব্যবসায়ী সুদের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

এখন বুঝা গেল, নববী যুগে লাভজনক ক্ষেত্রে খাটানোর জন্য সুদী লেনদেনের প্রচলন ছিল। সাথে সাথে এটাও বুঝা গেল যে, এ সুদ হারাম এবং অবৈধ।

আরও একটি দলিল

আরেকটি হাদীসে চিন্তা করা উচিত। হাদীসটি হলো-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى اَحَدٌ اِلَّا اَكَلَ الرِّبٰوا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ-

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- সামনে এমন এক যুগ আসবে, যখন একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, সে সুদ খায়নি। আর যদি এক দু'জন মিলেও যায় যে, তারা সুদ খায়নি কিন্তু তার হাওয়া নিশ্চয়ই তার গায়ে লাগবে। [আবুদ দাউদ ও ইবনে মাজার সূত্রে দুররে মানসুর]

এ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক যুগের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যখন সুদের প্রচলন খুব বেশি হারে থাকবে। যদি এ দ্বারা আমাদের এ যুগকে ধরা হয়, তাহলে একটু চিন্তা করে দেখুন, কোন সুদ এমন বিস্তৃতি লাভ করেছে যা থেকে বাঁচা মুশকিল। সবাই জানেন, এ যুগে ব্যবসায়ী সুদ ভীষণভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং মহাজনী সুদ কমেই গিয়েছে বলা যায়। আর যদি এ হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীটি সামনে কোন যুগের জন্য হয়, তবে প্রথমত এটা স্পষ্ট যে, ব্যবসায়ী সুদই বাড়বে এবং মহাজনী সুদ কমতে থাকবে। দ্বিতীয়ত যৌক্তিক দিক থেকে এটা বুঝা যায় না যে, মহাজনী সুদের সাধারণ প্রচলনের কারণে তার প্রভাব সবার কাছে গিয়ে পৌঁছবে। এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ মহাজন বনে যাবে, আর সুদ নিয়ে নিয়ে খাবে। যদিও ধরে নেয়া হয় যে, এমনটি হবে, তাহলে সে ক্ষেত্রে যারা সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেবে না তারা সুদ থেকে বেঁচে থাকবে। এমনকি সুদের হাওয়াও তাদের গায়ে লাগবে না। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- প্রত্যেকের গায়েই এর হাওয়া লাগবে।

সুদের সাধারণ বিস্তৃতির কারণে সবার গায়ে সুদের হাওয়া লাগতে হলে ক্ষেত্র হতে হবে ব্যবসায়ী সুদ। এর মাধ্যমেই এটা হতে পারে। যেমন- বর্তমান ব্যাংকিং সিস্টেমে তা হচ্ছে। প্রায় অর্ধেক দুনিয়ার টাকা ব্যাংকে জমা থাকে। যার বিনিময়ে তাদেরকে সুদ দেয়া হয়। বড় বড় শিল্পপতি এসব ব্যাংক থেকে সুদী ঋণ নেয় এবং সুদ প্রদান করে। ছোট ব্যবসায়ী ব্যাংকে টাকা জমা রাখে। তারপর আবার এখন এমন বৃহদাকারে ব্যাংক হচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্যাংকে হাজার হাজার লোক চাকরি করে। এভাবে কোন না কোনভাবে সুদের অপবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছে। আর যারা একেবারেই সম্পর্ক রাখে না, তারপরও সেসব মাল সুদের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে এবং তার ধারাবাহিকতা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে সবাই সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। যেটাকে হাদীসে 'সুদের হাওয়া' বলা হয়েছে। যা থেকে বাঁচার দাবী বড় বড় মুত্তাকীগণও করতে পারবেন না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরের হাদীসটি ব্যবসায়ী সুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)

তাছাড়া হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)-এর যে কর্মপন্থা এ ব্যাপারে হাদীস থেকে জানা যায়, তা আজকালকার প্রচলিত ব্যাংকিং সিস্টেমের সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল।

হযরত যুবায়ের (রা.) আমানতদারী ও দীনদারীতে প্রসিদ্ধ এক সাহাবী। তাই বড় বড় লোকেরা তাঁর কাছে নিজেদের টাকা-পয়সা ইত্যাদি জমা রাখতো এবং প্রয়োজন মাফিক আবার তা উঠিয়ে নিত। হযরত যুবায়ের (রা.)-এর ব্যাপারে বুখারী শরীফে 'জিহাদ' অধ্যায়ের 'বরকাতুল গাজী ফী মালিহি' পরিচ্ছেদে, তাবাকাতে ইবনে সাদের 'তাবাকাতুল বদরিয়্যিনা মিনাল মুহাজিরীন' অধ্যায়ে আমানত হিসেবে গ্রহণ করতেন না। বরং বলতেন–

لَا وَلٰكِنَّ هُوَ سَلَفٌ

এটা আমানত নয়, এটা ঋণ।

এর উদ্দেশ্য কী ছিল? বুখারীর ব্যাখ্যাকার হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন–

كَانَ غَرْضُهُ بِذَالِكَ اَنَّهُ كَانَ يَخْشٰى عَلَى الْمَالِ اَنْ يُّضِيْعَ فَيَظُنُّ بِهِ التَّقْصِيْرَ فِىْ حِفْظِهِ فَرَاٰى اَنْ يَّجْعَلَهُ مَضْمُوْنًا فَيَكُوْنُ اَوْثَقَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَاَبْقٰى لِمُرُوَّتِهِ- وَزَادَ ابْنُ بَطَّالٍ لِيَطِيْبَ لَهُ رِبْحُ ذَالِكَ الْمَالِ-

অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য ছিল, তার ভয় ছিল যে, যদি কখনও এসব মাল নষ্ট হয়ে যায় আর সবাই মনে করে যে, তিনি এর হেফাজতে অলসতা করেছেন। তাই তিনি এটাকে অবশ্য পরিশোধযোগ্য ঋণ বানিয়ে গ্রহণ করতেন। যেন মালিক ভরসা বেশি পায় এবং তাঁর বিশ্বস্ততা ঠিক থাকে। ইবনে বাত্তাল এটাও বলেন– এটা তিনি এজন্যও করতেন

যেন ঐ মাল দিয়ে ব্যবসা করা এবং লাভ অর্জন করা তাঁর জন্য বৈধ হয়ে যায়। [ফাতহুল বারী : ৬ : ১৭৫]

এভাবে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর কাছে কত বিরাট অংকের টাকা জমা হয়ে যেত তা তাবাকাতে ইবনে সাদের বর্ণনা দ্বারা ধারণা করা যায়।

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُوْنِ فَوَجَدْتُهُ اَلْفَىْ اَلْفٍ وَمِائَتَىْ اَلْفٍ-

অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন– আমি তাঁর ঋণের হিসাব করে দেখলাম যে তার পরিমাণ বিশ লক্ষ।

হযরত যুবায়ের (রা.)-এর মত ধনী সাহাবীর জন্য এ বিশ লক্ষ টাকার ঋণ স্পষ্টতই কোন আপদকালীন ঋণ বা দারিদ্র্যতাকালীন ঋণ ছিল না। রবং এটা আমানতের মতো ছিল। এর পুরো টাকা ব্যবসায় খাটানো হতো। কেননা, হযরত যুবায়ের (রা.) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহকে ওসিয়ত করেন যে, আমার পুরো সম্পদ বিক্রি করে এ টাকা পরিশোধ করে দেবে। বর্ণনাটি তাবাকাতে ইবনে সাদে রয়েছে। তিনি বলেন–

يَابُنَىَّ! بِعْ مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنِىْ-

বৎস! আমার সম্পদ বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করবে।

পঞ্চম দলিল

ইমাম বগভী (রহ.) আতা ও ইকরামা (রহ.)-এর সূত্রে একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন– হযরত আব্বাস ও হযরত উসমান (রা.) এক ব্যবসায়ীর কাছে সুদী টাকা পেতেন। তাঁরা ঐ ব্যক্তির কাছে সে টাকা চেয়ে পাঠান। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিবা হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদেরকে সুদী টাকা গ্রহণ করতে নিষেধ করে দেন।

এ হাদীসটিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, হযরত আব্বাস ও উসমান (রা.) এ টাকা একজন ব্যবসায়ীকে ঋণ দিয়েছিলেন।

হিন্দ বিনতে উতবার ঘটনা

আল্লামা তাবারী তেইশ হিজরীর ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা এটাও বর্ণনা করেন–

إِنَّ هِنْدًا بِنْتِ عُتْبَةَ قَامَتْ إِلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَضَتْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَرْبَعَةَ الاَفٍ تَتَّجِرُ كَلْبَ فَاشْتَرَتْ وَبَاعَتْ-

অর্থাৎ হিন্দ বিনতে উতবা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আসল। বাইতুল মাল থেকে চার হাজার ঋণ চাইল। উদ্দেশ্য হলো তা দিয়ে ব্যবসা করবে এবং এর জামিন হবে। হযরত উমর (রা.) দিয়ে দেন। তারপর তিনি কালব শহরগুলোতে যান এবং পণ্য কিনে বিক্রি করেন।

এ হাদীসে বিশেষভাবে ব্যবসার জন্য ঋণ লেনদেনের আলোচনা এসেছে। তারপরও কি এটা বলা সম্ভব যে, ইসলামী যুগে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঋণ লেনদেনের প্রচলন ছিল না? হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, এ ঋণের উপর সুদ লেনদেনের প্রচলন কুরআনী বিধান নাযিল হওয়ার পর আর থাকেনি। যেমন এ হাদীসে চার হাজার ঋণ লেনদেন হয়েছে সুদবিহীন।

হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনা

মুয়াত্তা ইমাম মালিকের একটি লম্বা হাদীস এসেছে। যার সারাংশ হলো– হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.) এবং উবায়দুল্লাহ (রা.) এক বাহিনীর সাথে ইরাক গেলেন। ফেরার সময় হযরত আবু মুসার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। তিনি বলেন, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই আমি তা করবো। তারপর বলেন– আমার কাছে বাইতুল মালের কিছু টাকা আছে। আমি তা আমীরুল মুমিনীনের কাছে পাঠাতে চাই। তা আমি আপনাকে ঋণ দিচ্ছি। এটা দিয়ে আপনি ব্যবসায়ী পণ্য কিনে নিয়ে যান এবং মদীনায় গিয়ে বিক্রি করে

দিন। আর মূল টাকা আমীরুল মুমিনীনকে দিয়ে লভ্যাংশটি নিজে রেখে দেবেন। তারপর এভাবেই করা হয়েছে। এ ঘটনাতেও ব্যবসার জন্যই ঋণ নেয়া হয়েছে।

ইসলামী যুগের কতক ঘটনাবলী আমাদের সামনে এসেছে। ভাল করে খোঁজ করলে আরও অনেক এমন প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু সবগুলো একত্রিত করে বিষয়বস্তুকে দীর্ঘায়িত করার কোন প্রয়োজন নেই। উপরে বর্ণিত সাতটি স্পষ্ট এবং নির্ভেজাল দলিল একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষকে এ মত পোষণ করতে বাধ্য করতো যে, ব্যবসায়ী ঋণ আধুনিক যুগের আবিষ্কার নয়; বরং তা প্রাচীন আরবেও প্রচলিত ছিল। আমরা যেসব হাদীস উপরে বর্ণনা করেছি, তার মাধ্যমে এ বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ব্যবসায়ী ঋণ এবং তার উপর সুদী লেনদেন তৎকালীন আরব সমাজে অপরিচিত কোন বিষয় ছিল না। বরং তাও সাধারণভাবেই প্রচলিত ছিল। যেমন ছিল মহাজনী সুদ।

দ্বিতীয় গ্রুপ

ব্যবসায়ী সুদকে বৈধতা দানকারী আরেকটি গ্রুপ হলো তারা যারা নিজেদের দলিল প্রমাণের ভিত্তি জাহিলী যুগে সুদের প্রচলন থাকা না থাকার উপর স্থাপন করেনি। বরং তারা এর বৈধতার পক্ষে কিছু স্পষ্ট দলিল পেশ করে। তারা কয়েকটি দলিল পেশ করেছে। আমরা এর প্রত্যেকটিকে নিয়ে পর্যালোচনা করবো।

ব্যবসায়ী সুদ কি জুলুম নয়

তাদের প্রথম দলিল হলো, ব্যবসায়ী সুদ নববী যুগে ছিল না কি ছিল না এটা কোন আলোচনার বিষয় নয়। মাসআলার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এটা অবশ্যই আমাদেরকে দেখতে হবে যে, সুদ অবৈধ হওয়ার মূল ব্যাপারটি ব্যবসায়ী সুদের মধ্যে আছে কি না?

তারা বলে, সুদ হারাম হওয়ার কারণ হলো– তাতে ঋণগ্রহীতার ক্ষতি হয়। অসহায় ব্যক্তিটি শুধু তার অসহায়ত্বের অপরাধে একটি পণ্যের মূল্য মূল

মূল্যের চেয়ে বেশি দেয়। অন্য দিকে ঋণদাতা তার বাড়তি সম্পদ ব্যবহার করে কোন শ্রম ছাড়াই অনেক সম্পদ কামাই করে যা স্পষ্ট জুলুম। কিন্তু এ ব্যাপারটি ব্যবসায়ী সুদে পাওয়া যায় না। বরং তাতে ঋণদাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হয়। ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা ব্যবসায় খাটায় এবং লাভ কামাই করে। আর ঋণদাতা ঋণের বিনিময়ে সুদ নিয়ে লাভ কামায়। তাই এখানে কারও প্রতি জুলুম করা হয়নি।

এ যৌক্তিক দলিলটি আজকাল খুব মার্কেট পেয়েছে। মানুষকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। বাহ্যিকভাবে খুবই চমৎকার। কিন্তু একটু যদি চিন্তা-গবেষণা করা যায় তাহলে আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এটাও প্রথম গ্রুপের দলিলগুলোর মতো একেবারেই ফুলানো ফাঁপানো এবং অন্তঃসারশূন্য। তাদের এ দলিলের ভিত্তি হলো– ব্যবসায়ী সুদে উভয় পক্ষের কারও ক্ষতি হয় না। অথচ সুদ হারাম হওয়ার কারণ শুধু এটা নয়। যা ব্যবসায়ী সুদকে বৈধতা দানকারীরা পেশ করে থাকে। এর আরও অনেক কারণ রয়েছে। মোট কথা, সুদ হারাম হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে এটাও একটা কারণ যে, কোন পক্ষের ক্ষতি তাতে অবশ্যই হচ্ছে। আর ক্ষতিকারক লেনদেন অবৈধ। কিন্তু একটু পরিবর্তন করে তারা এখানেই কথা শেষ করে দিয়েছেন যে, যেখানে এক পক্ষের ক্ষতি এবং অন্য পক্ষের উপকার হয়, তা অবৈধ। আর উভয় পক্ষ উপকৃত হলে তা বৈধ। অথচ কথা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং যদি উভয়ের উপকার হতে পারে কিন্তু তন্মধ্যে একজনের উপকার একদম নিশ্চিত এবং আরেক জনেরটা নিশ্চিত নয়, সন্দেহজনক– তাহলেও তো এমন লেনদেন অবৈধ হবে। যেমন-মুখাবারা-এর আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

জনাব ইয়াকুব শাহ সাহেব মাসিক সাকাফত- ডিসেম্বর ১৯৬১ সংখ্যায় এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন–

কুরআনে কি এমন কোন বিধান আছে, যা লভ্যাংশের অংককে অনির্ধারিত রাখার জায়গায় নির্ধারিত করে ফেলাকে অবৈধ ঘোষণা করে?

আমরা এর জবাবে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করবো, মুখাবারা অবৈধ হওয়ার কারণ কী? মুখাবারাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা বলে কেন অভিহিত করলেন? শুধু!

এবং শুধু এ জন্য যে, তাতে এক পক্ষে লাভ নিশ্চিত এবং অপর পক্ষের লাভ সন্দেহজনক। লাভবানও হতে পারে বা ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে।

এখন চোখ খুলে দেখুন এ কারণটি ব্যবসায়ী সুদের মধ্যে পাওয়া যায় কি না? এটা তো সবার কাছেই স্পষ্ট যে, ঋণগ্রহীতা তার ঋণের টাকা ব্যবসায় খাটানোর পর এটা অবশ্যম্ভাবী নয় যে, তার অবশ্যই লাভ হবে। বরং তার ক্ষতিও হতে পারে বা লাভ হয়েছে এবং সুদ পরিশোধ করার পরও কিছু বেচে আছে। অথবা হতে পারে ব্যবসায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিংবা হতে পারে, লাভ হয়েছে কিন্তু পরিমাণ এত কম যে সুদই পরিশোধ করতে পারছে না বা পরিশোধ তো করতে পেরেছে কিন্তু তারপর তার ভাগ্যে আর কিছুই থাকেনি। অথবা লাভ তো অনেক হয়েছে কিন্তু তা হাতে আসতে এত সময় ব্যয় হয়ে যাবে যে, ঐ দিকে তার সুদও চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে এবং পরিশেষে দেখা যাবে ফলাফল শূন্য। এমনকি হতে পারে লাভের চেয়ে সুদের অংক বড় হয়ে গিয়েছে।

ধরুন, আপনি কারও থেকে বার্ষিক তিন শতাংশ সুদের ভিত্তিতে এক হাজার টাকা ঋণ নিলেন এবং কোন ব্যবসায় খাটালেন। এখন নিম্নে বর্ণিত যৌক্তিক কিছু সম্ভাবনা তাতে দেখা যাবে–

১. এক বছরে আপনার পাঁচশ' টাকা লাভ হয়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আপনি লাভবান হলেন। ত্রিশ টাকা ঋণদাতাকে দিয়ে বাকী টাকা আপনি পেয়ে গেলেন।

২. এক বছরে আপনার ষাট টাকা লাভ হয়েছে। তা থেকে ত্রিশ টাকা ঋণদাতাকে দিয়ে বাকী টাকা আপনি নেবেন।

৩. পাঁচ বছরে আপনার লাভ হয়েছে দুশ' টাকা। তন্মধ্যে দেড়শ' টাকা ঋণদাতাকে দেবেন এবং পঞ্চাশ টাকা আপনার থাকবে।

৪. পাঁচ বছরে আপনার দেড়শ' টাকাই লাভ হয়েছে। তখন আপনি পুরো লভ্যাংশ সুদ পরিশোধে ব্যয় করে দেবেন আর আপনি শূন্য।

৫. এক বছরে আপনার মুনাফা হয়েছে মোট ত্রিশ টাকা। এখনও আপনি পুরো লভ্যাংশ সুদের জন্য দিয়ে আপনি শূন্য।

৬. এক বছরে আপনার দশ টাকা লাভ হয়েছে। এখন আপনি পুরো লাভ দিয়েও নিজের পকেট থেকে আরো বিশ টাকা যোগ করে সুদী পাওনা

পরিশোধ করবেন।

৭. আপনি এক বছর ধরে ব্যবসা করছেন কিন্তু এক টাকাও লাভ হয়নি। এখন আপনার শ্রমও বেকার এবং বিশ টাকা নিজের পকেট থেকে দিতে বাধ্য থাকবেন।

৮. আপনি দশ বছর ধরে ব্যবসা করছেন। তারপরও কোন লাভ হলো না। এখন আপনাকে তিনশ' টাকা পকেট থেকে শোধ করতে হবে।

৯. আপনি এক বছর যাবত ব্যবসা করছেন। কিন্তু তাতে একশ' টাকা লোকসান হয়েছে। এখন আপনাকে লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে পকেট থেকে ত্রিশ টাকা শোধ করতে হবে।

১০. আপনি দশ বছর যাবত ব্যবসা করছেন। তাতে একশ' টাকা লোকসান হয়ে গিয়েছে। এখন আপনাকে লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে তিনশ' টাকা সুদ বাবত শোধ করতে হবে।

এ দশটি অবস্থার মধ্যে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা এমন যে, তাতে উভয় পক্ষ লাভবান হয়েছে। কারও কোন ক্ষতি হয়নি। বাকী আটটি অবস্থায় ঋণগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত। কখনও লাভই হয়নি। কখনও উল্টো লোকসান হয়েছে। কখনও লাভ যা হয়েছে সবই সুদ দিতে গিয়ে আর কিছুই থাকেনি। কোথাও ব্যবসাই হয়নি। কিন্তু প্রত্যেকটি অবস্থায় ঋণদাতার কোন ক্ষতি হয়নি। সে বহাল তবিয়তে ঋণগ্রহীতার লাভ হোক বা না হোক তার প্রাপ্য সে পেয়েই গিয়েছে।

এখন আপনি নিষ্ঠার সাথে একটু চিন্তা করে দেখুন, এটা কি কোন ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা? যেখানে দু'জনের মধ্যে একজনের কখনও ক্ষতি হয় কখনও লাভ হয় অথচ অন্যজন শুধু লাভ আর লাভ গোনতে থাকে। এমন লেনদেনকে কোন শরীয়ত বা কোন বুদ্ধিমান লোক মেনে নিতে পারে? এ ব্যাপারে জনাব ইয়াকুব শাহ সাহেব বলেন–

ব্যবসাকে উপলক্ষ করে সুদের ভিত্তিতে ঋণ এজন্য নেয়া হয় যে, ঋণগ্রহীতা আশা করে যে সে সুদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি লাভ কামাই করবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। তা না হলে লাভজনক সুদ এভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে পারতো না। তেমনি ঋণদাতা

একটা ছোট অংশ নির্ধারিত সময়ে পেয়ে যেতে থাকে। কখনও ঋণগ্রহীতা তার মূলধনের চাইতেও কয়েকগুণ বেশি লাভ অর্জন করতে সক্ষম হয়। আবার কখনও সে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। কিন্তু এ ঝুঁকিকে মেনে নেয়া ব্যবসায় সাধারণ একটা ব্যাপার। আর এটা এমন ব্যাপার নয় এবং তা থেকে এমন কোন ভীষণ খারাপ কিছু সৃষ্টি হয় না, যে কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা সংক্রান্ত শাস্তির সে উপযুক্ত হয়ে যাবে। [সাকাফত : ডিসেম্বর ১৯৬১]

তাঁর এ বক্তব্যের জবাবে আমরা শুধু এটুকুই বলবো যে, লাভের আশা পোষণ করার দ্বারা ব্যাপারটি বৈধতা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা লাভের আশা তো কৃষকও মুখাবারার মধ্যে করে থাকে। আর এ জন্যই তো সে কাজ করতে নেমে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী মুখাবারা অবৈধ। আর তার ব্যাপারেই 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা' সংক্রান্ত সতর্কবাণী উচ্চারতি হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ-

> যে ব্যক্তি মুখাবারা ছাড়বে না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখুক। [আবু দাউদ, হাকিম]

পুঁজি ও শ্রমের অংশীদারিত্বে ইসলামী ধারণা

ইসলামী আইন পুঁজি ও শ্রমের অংশীদারিত্বের একটি সাদাসিধে সহজ-সরল এবং কার্যকরী পন্থা 'মুদারাবত' প্রবর্তন করেছে। একজনের পুঁজি অন্যের শ্রম এবং লভ্যাংশে উভয়ের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে উভয়ের জন্য একই পন্থায়। এর দ্বারা কারও অধিকার নষ্ট হবে না। কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। কেউ কাউকে শোষণ করবে না। উভয়ে সার্বিকভাবে বরাবর। লাভ হলে তা দু'জনেরই। ক্ষতি হলেও তাও দু'জনে বহন করবে। কিন্তু কেন যেন মানুষ ইসলামী সহজ-সরল ব্যবসানীতি ছেড়ে তা থেকে দূরে চলে গিয়েছে। না কি পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা মানুষের বুদ্ধির

উপর পর্দা ফেলে দিয়েছে। ফলে মানুষ সোজা সাপ্টা শেয়ারনীতিকে ছেড়ে দিয়ে কঠিন এবং ক্ষতিকর পন্থা ধরে রাখতে বেশি পছন্দ করছে।

জনাব মোহাম্মদ জাফর শাহ সাহেব 'কমার্শিয়াল ইন্টারেস্টের ইসলামী অবস্থান' শীর্ষক আলোচনায় মুদারাবত-এর ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন– অধিকাংশ এমন হয় যে, এক লোক শস্যের ব্যবসা করে। তার কাছে অনেক পুঁজিও আছে। দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি তাকে বলল, আমি ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার অভিজ্ঞতা রাখি। কিন্তু আমার কাছে পুঁজি নেই। তুমি যদি পুঁজি বিনিয়োগ কর তাহলে তাতে বিশেষ লাভ করা যাবে। যাতে আমরা উভয়ে অংশীদার হবো। এখন শস্য ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় পুঁজি খাটাতে পারে এবং সাথে সাথে ঐ ব্যক্তির লাভও চাইছে। সে চাইছে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ও শরীক হবে। কিন্তু তার এ খেয়ালও হতে পারে যে, আমি নিজে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার ব্যাপারে অজ্ঞ। আমার অজ্ঞতা থেকে সে ফায়দা লুটতে পারে। যেমন লাভ কম দেখিয়ে আমার অংশ কমিয়ে দিতে পারে। আমি বাস্তবিক লভ্যাংশটা নাও পেতে পারি। তাছাড়া আমি সে হিসাব-কিতাব পর্যবেক্ষণের জন্য সময়ও বের করতে পারবো না। এমতাবস্থায় তার কাছে এছাড়া আর কোন পথ নেই যে, সে তাকে সুদের উপর ঋণ দিয়ে দেবে এবং একটা ন্যূনতম নির্ধারিত লভ্যাংশের উপর সন্তুষ্ট থাকবে।

আমাদের আফসোস হয়! তারা অনেক খোঁজ খবর নিয়ে একটা লম্বা চওড়া পন্থা বের করে নিয়েছেন। কিন্তু তাতে মুদারাবতের পন্থা ছেড়ে দেয়ার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। কেননা কোন বোকা থেকে বোকা মানুষও এমন বোকামী করতে পারে না যে, শুধু ধোকা খাওয়ার কল্পিত ভয়ে নিজের বেশি লভ্যাংশকে ছেড়ে দিয়ে কম লভ্যাংশের উপর রাজি হয়ে যাবে। ধরে নেয়া যাক, যদিও তার পার্টনার ধোকা দিয়ে তাকে লভ্যাংশ কম দিল, তবুও তার জন্য সুদের কম হার নেয়া এবং মুদারাবতের ক্ষেত্রে ধোকার কারণে কম লভ্যাংশ পাওয়া তো সমান কথা। তাহলে বেহুদা হাত ঘুরিয়ে নাক ধরার প্রয়োজন কী? আর যদি সে তার পার্টনারের পরিচয়ের ব্যাপারে এ ধরনের মন্দ ধারণা রাখে, আর বুঝতে পারে যে, সে তাকে ধোকা দিতে পারে– লাভ হলেও তা প্রকাশ না করতে পারে বা প্রকাশ করলেও কম দেখাতে পারে, তাহলে এমন ব্যক্তির সাথে লেনদেন করে

তার সাহস বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাকে কোন ডাক্তার সাহেব পরামর্শ দিয়েছেন?

হ্যাঁ, এ ধারণা ঐ ব্যক্তির মনে অবশ্যই আসবে যে লভ্যাংশে ধারাবাহিকভাবে শরীক থাকতে চায় এবং সাথে সাথে ক্ষতি থেকে বাঁচার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে। তার মনে এ সংশয় থাকবে যে, আমার যেন কোন বিপদে পড়তে না হয়। কোন ক্ষতি হলেও তার প্রভাব আমাকে যেন না পায়; বরং আমার লাভ সব সময় যেন ঠিক থাকে।

ইসলামী ন্যায়পরায়ণ মেজায ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার ব্যাপারে তাকে এর অনুমতি দিবে না। এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুদের পক্ষপাতিত্বকারীদের ঐ দলিলের অসারতা প্রমাণ হয়ে যায়, যাতে তারা ব্যবসায়ী সুদকে মুদারাবাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে তাকে বৈধতা দিতে চায়। বিগত আলোচনার মাধ্যমে এখন ব্যবসায়ী সুদ এবং মুদারাবাতের বিশাল পার্থক্য আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মুদারাবাতে উভয় পক্ষ লাভ লোকসানের অংশীদার হয়। আর ব্যবসায়ী সুদে একজনের লাভ নিশ্চিত করা হয় আর অন্যজনের লাভ সম্ভাবনাময় রাখা হয়। সুতরাং এটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

ব্যবসায়ী সুদ পারস্পরিক সন্তুষ্টির সওদা

এ গ্রুপের দ্বিতীয় দলিল হলো, কুরআন অন্যায়ভাবে খাওয়া থেকে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ-

অর্থাৎ হে ঈমানদারেরা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।

ব্যবসার যেসব পন্থায় অন্যায় ভক্ষণ রয়েছে তা তো হারাম। আর এটা স্পষ্ট যে, যেখানে অন্যায় ভক্ষণ থাকবে সেখানে অবশ্যই এক পক্ষের অসন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। অন্যায় ভক্ষণে ভক্ষণকারী তো রাজি থাকবে। কিন্তু

যার খাওয়া হয় সে তাতে রাজি থাকবে না। সে এটাকে বাধ্য হয়ে সহ্য করে। ফলে দেখা যায়, কোন এমন ব্যবসা যাতে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি রয়েছে। তাহলে নিঃসন্দেহে এটা অন্যায় ভক্ষণের আওতায় পড়বে না। এখন এ দৃষ্টিকোণ থেকে কমার্শিয়াল ইন্টারেস্টকে দেখুন, সেখানে ঋণগ্রহীতা বাধ্য এবং মজলুম হয় না। তেমনি সে ঋণদাতার লভ্যাংশের ব্যাপারেও অসন্তুষ্ট নয়। সুতরাং যে রিবা হারাম তা হলো– যেখানে এক পক্ষের ব্যক্তিস্বার্থমূলক লাভ এবং অন্যের লোকসান। কমার্শিয়াল ইন্টারেস্টে যে ব্যবসা করা হয় তাতে পরস্পর দু'জনেরই সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। [কমার্শিয়াল ইন্টারেস্টের ইসলামী অবস্থান : জাফর শাহ সাহেব]

আমরা তাদের দলিল প্রমাণের আগাগোড়া এখানে আলোচনা করেছি। আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন যে, আজ পর্যন্ত কোন বুদ্ধিমান লোক কি দুই পক্ষের সন্তুষ্টিকে একটি হারাম কাজের ক্ষেত্রে হালাল হওয়ার দলিল বলে ঘোষণা করে দেন? উভয় পক্ষ রাজি হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে কি কেউ বৈধ বলতে পারবে? বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই। এই ব্যবসার মধ্যেই অনেক প্রক্রিয়া এমন পাওয়া যাবে যাতে উভয় পক্ষ রাজী হয়, কিন্তু তার পরও তা অবৈধ। হাদীসের কিতাবসমূহে অবৈধ ব্যবসার চ্যাপ্টারগুলো খুলে দেখুন– মুহাকালা, তালক্কিউল জালাব ইত্যাদি ব্যবসার এসব পন্থায় উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

আসলে ইসলামের প্রজ্ঞাময় দৃষ্টি বাহ্যিক জিনিসের দিকে নিবদ্ধ হয় না। সে আম জনতার স্বাচ্ছন্দ এবং তাদের সার্বিক উপকারের চিন্তা করে, কামনা করে। তাই ইসলাম কোন ব্যাপারে পারস্পরিক সন্তুষ্টিকে বৈধতার মাপকাঠি বানায়নি। কেননা পারস্পরিক সন্তুষ্টি তো নিজেদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে কিন্তু হতে পারে তা মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক। আলোচিত ব্যবসার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাতে কারও লোকসান নেই। উভয়েই লাভবান এবং উভয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু এর কারণে পুরো জাতি দারিদ্রতা অর্থনৈতিক মন্দা এবং চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে যায়। এজন্য ইসলাম এগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম প্রত্যেক ব্যাপারে এমন প্রশস্ত পরিসরে গবেষণা করে, যেখানেই সমস্যা দেখা যায় সেখানেই বাঁধ দিয়ে দেয়।

উদাহরণত একটি হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ-

শহরের লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য ক্রয় করো না।

এ হাদীসের মাধ্যমে ইসলাম মধ্যম বিক্রেতাদের (Middleman) ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যারা প্রত্যেকটি ব্যাপারে হালকা দৃষ্টিকোণে এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত, তারা এ বিধানের গূঢ় রহস্য অনুধাবনে ব্যর্থ হবেন। তাদের চোখে এ বিধানটি জুলুম মনে হবে। এ জন্যই তারা হালাল-হারামের মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন দু'পক্ষের সন্তুষ্টি আর অসন্তুষ্টি। তারা ভাববেন, এক গ্রাম্য লোক পণ্য নিয়ে আসে। আর এক শহরের লোকের কাছে তার পণ্য বেচার জন্য মাধ্যম বা ওকিল বানায়, তাতে কি আর আসে যায়? এখানে গ্রাম্য লোকেরও লাভ। তার বেশি পরিশ্রম করা লাগল না এবং তার পণ্য ভালো দামে বিক্রি হয়ে গেল এবং মধ্যম বিক্রেতার (Middleman)ও লাভ। সে এ পণ্য বিক্রিতে কমিশন পাবে। তার চিন্তা-চেতনা ব্যক্তিস্বার্থ আর সন্তুষ্টির চক্রে ঘুরপাক খেতেই থাকবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামী আইনের ধারার ব্যাপারে ওয়াকিফহাল, সে এ বিধানের গভীরে লুকিয়ে থাকা জাতির সামাজিক উন্নতির দিশা অনুধাবন করে ভক্তি আর শ্রদ্ধা ভরা কণ্ঠে মনের অজান্তেই বলে উঠবে–

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

আহ! আমার মহান প্রভু! তুমি কোন কিছুই অযথা সৃজন করোনি।

(আমরা না বুঝলেও তাতে অনেক কল্যাণকর রহস্য লুকিয়ে আছে।)

সে তৎক্ষণাৎই বুঝতে পারবে যে, ইসলাম এ আইন এ জন্য প্রণয়ন করেছে যে, এর দ্বারা মানবতার উপকার সাধিত হবে। যদি গ্রাম্য লোক শহরের লোককে মধ্যম বিক্রেতা বা ওকীল বানায়, তাহলে সে বাজারের ভাও দেখে তার পণ্য বাজারে ছাড়বে। যখন দর কম থাকবে তখন তা স্টক

করে রাখবে। আবার যখন বাজার চড়া হবে, বাজারেও পণ্যের অভাব দেখা দেবে তখন সে তার পণ্য বাজারে ছাড়বে এবং ইচ্ছা মাফিক মূল্যে বিক্রি করবে। ফলে গোটা সমাজ অভাবের শিকার হবে এবং সে তার সম্পদ জড়ো করতে থাকবে। এমনকি জাতি দরিদ্র থেকে দরিদ্র হতে থাকবে আর এসব মহাজনরা তাদের পকেট গরম করতে থাকবে। পক্ষান্তরে যদি গ্রাম্য ঐ লোক নিজে তার পণ্য বিক্রি করে তখন সে তো এত বোকা নয় যে, নিজের ক্ষতি করে বিক্রি করবে। স্পষ্ট ব্যাপার, সে লাভেই বিক্রি করবে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই মধ্যম বিক্রেতার চেয়ে তার মূল্য অনেক কম থাকবে। আর সে স্টক করেও বিক্রি করবে না। ফলে বাজার সস্তা থাকবে। সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারবে।

মোট কথা, শুধু দু'পক্ষের সন্তুষ্টি একটা ব্যাপারকে হালাল বা হারাম করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। কেননা, দু'জনের সন্তুষ্টিতে সম্পাদিত কোন কাজ পুরো মানবতার জন্য ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। একই অবস্থা ব্যবসায়ী সুদের। যদিও তাতে উভয় পক্ষ রাজি এবং খুশি কিন্তু এতেই তা বৈধ হতে পারে না। কেননা, এটা পুরো মানবতাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

আমরা উপরে যা বলেছি তা জাফর শাহ সাহেবের উপস্থাপিত আয়াত থেকেই নেয়া হয়েছে। যা তিনি তার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ-

> হে ঈমানদারেরা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। কিন্তু যদি তা ব্যবসা হয় এবং পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে সম্পাদিত হয়।

এখানে আল্লাহ তাআলা লেনদেন বৈধ হওয়ার জন্য দুটো শর্ত উল্লেখ করেছেন। একটি হলো, ব্যবসা হতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো, পরস্পর সন্তুষ্টচিত্তে তা সম্পাদন করবে। শুধু পারস্পরিক সন্তুষ্টি কারবারকে বৈধতা দেবে না। তেমনি শুধু ব্যবসা হলেই তা বৈধতা পাবে না। উভয়টিই এক সাথে হতে হবে। তাহলেই লেনদেন বৈধতা পাবে।

ব্যবসায়ী সুদে পারস্পরিক সন্তুষ্টি তো আছে। কিন্তু যেহেতু এটা মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক ব্যাপার তাই ইসলাম এটাকে ব্যবসা বলে না। একে রিবা নামে আখ্যায়িত করে। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ অবৈধ।

হাদীস কি তাদেরকে সমর্থন করে

ব্যবসায়ী সুদকে বৈধতা দানকারীরা তাদের দলিল প্রমাণকে সত্যায়ন করার জন্য শক্তিশালী করার জন্য কিছু হাদীস পেশ করে থাকে। যদ্বারা তারা এটা প্রমাণ করতে চায় যে, সুদে যদি পারস্পরিক সন্তুষ্টি থাকে, অত্যাচারী হস্তক্ষেপ না থাকে তাহলে তা বৈধ হতে পারে। যেমন- নীচের হাদীসগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক–

১. হযরত আলী (রা.) তাঁর উসাইফির নামক একটা উট বিশটি ছোট উটের বিনিময়ে বিক্রি করেছেন। তাও আবার বাকীতে। [মুয়াত্তা মালিক]

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কিছু দিরহাম ঋণ নিয়েছেন। তারপর তিনি তার চেয়ে উত্তম দিয়েছেন। তখন ঋণদাতা তা নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, এটা আমার দেয়া দিরহামগুলো থেকে উত্তম। হযরত ইবনে উমর জবাব দেন, এটা তো আমার জানা আছে। কিন্তু আমি সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছি। [মুয়াত্তা মালিক]

৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির (রা.) থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধের সময় বেশি দেন।

৪. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

خِيَارُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধকারী তোমাদের মধ্যে উত্তম।
[আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আবু দাউদ]

জবাব : কিন্তু মূল ব্যাপার হলো, এসব হাদীস থেকে তাদের দাবীর পক্ষে দলিল হিসেবে নেয়া যাবে না।

১. হযরত আলী (রা.)-এর আমলকে দলিল হিসেবে নেয়া যাবে না। কেননা এর বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত হাদীস আমাদের সামনে আছে, যা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন।

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً۔

হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুকে পশুর বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। [তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারমী]

এটা একটি সহীহ হাদীস। হযরত জাবির, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর (রা.) থেকেও এমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। এটাকে ছেড়ে হযরত আলী (রা.)-এর একটি ঘটনা যার পুরো উপলক্ষও স্পষ্ট নয়। তাকে ফতোয়ার ভিত্তি বানিয়ে নেয়া হাদীস ও ফিকাহর মূলনীতির পরিপন্থী। তাছাড়া যদি সাহাবীর আমলকে মারফু হাদীসের সমমানও মেনে নেয়া হয়, তারপরও মূলনীতি অনুযায়ী তা আমলের অযোগ্যই হয়ে যায়। হালাল এবং হারাম উভয়টি যদি একই ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় তাহলে সর্বসম্মত মূলনীতি হলো ঐ হাদীসকে আমলের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে যা হারাম ঘোষণা করছে।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর আমল কোনভাবেই প্রমাণ করে না যে, তিনি সুদ দিয়েছেন। সেখানে ব্যাপার ছিল, তিনি যে দিরহামগুলো দিয়ে ঋণ পরিশোধ করেছেন তা আকৃতিগতভাবে ভালো ছিল। এমন ছিল না যে, দশ নিয়েছিলেন এবং এগার দিয়েছেন। 'খাইরুন' শব্দটি এ কথাই বুঝায়। তাছাড়া ঋণ নেয়ার সময় উভয়ের মধ্যে এমন কোন চুক্তি হয়নি। তখন তাদের এমন কোন ধারণাই ছিল না। সুতরাং পরে বেশি পরিশোধ করার অবস্থাটি এমন, যেমন কেউ কারও উপকারের বদলা দিতে গিয়ে তাকে কোন কিছু হাদিয়া হিসেবে পেশ করল। এটা বৈধ। যেহেতু চুক্তি করে এমনটি করা হয়নি।

৩. হযরত জাবেরের ঘটনাতেও একই ব্যাপার হয়েছে। তিনি নবীজীকে ঋণ দেয়ার সময় এ ধরনের কোন চুক্তি করেননি। হাদীসের শব্দই বলছে

যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিশোধের সময় তার পাওনা থেকে কিছু বেশি দিয়েছেন। বেশি কেমন এবং কতটুকু ছিল? হাদীস এ ব্যাপারে চুপ। হতে পারে যে, এই বেশিটা আকারের দিক থেকে ছিল। যদিও সংখ্যার দিক থেকে বেশি মেনে নেয়া হয়, তাহলে লক্ষণীয় যে, এটা কোন চুক্তিভিত্তিক ছিল না। তাই এটাও উত্তম পরিশোধ বা উপকারের প্রতিদান হিসেবে ধরে নেয়া যাবে। যে ব্যাপারে হাদীসেই উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে শেখুল ইসলাম আল্লামা নববী (রহ.) আবু রাফে (রা.)-এর হাদীসের আলোচনায় বলেন–

لَيْسَ هُوَ مِنْ قَرْضٍ جُدَّ مَنْفَعَةً فَاِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ
لِاَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوْطًا فِى الْعَقْدِ۔

অর্থাৎ এটা ঐ ঋণের অন্তর্ভুক্ত নয় যার মাধ্যমে কিছু লাভ কামাই করা হয়েছে। কেননা তা অবৈধ। আর অবৈধ তা-ই যা চুক্তির সময় শর্ত করে নেয়া হয়। [নববী শরহে মুসলিম : ২ : ৩০]

তাই যদি কেউ কারও প্রতি কোন অবদান রাখে, যেমন- সময় মত ঋণ দিয়ে দিয়েছে এবং সে ঋণ পরিশোধ করার সময় তার অবদানের পুরস্কার দেয়ার জন্য কোন টাকা বা জিনিস সন্তুষ্টচিত্তে পূর্বে কোন শর্তারোপ ছাড়া দিয়ে দেয়, তাহলে আজও এটা বৈধ। হারাম সুদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যদিও ইমাম মালিক (রহ.) এভাবেও টাকা বাড়িয়ে দেয়াকে অবৈধ বলেছেন এবং জাবির (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত বেশিকে আকৃতিগত বলেছেন। তাছাড়া এ লেনদেনের মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, তাতে সুদের কোন ধারণাই নেই। ঘটনা হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মাল থেকে তার ঋণ পরিশোধ করেছেন এবং ঋণের চাইতে একটু বেশি দিয়েছেন। এটা স্পষ্ট কথা, বাইতুল মালে সব মুসলমানের অধিকার আছে। বিশেষ করে উম্মতের উলামায়ে কিরাম, যাঁরা দীনের খেদমতে মগ্ন থাকেন। হযরত জাবির (রা.) আগে থেকেই বাইতুল মাল থেকে পেতেন, যা ইমাম বা খলীফার অধীনে থাকে। এর ব্যয়ের ক্ষেত্র তিনিই নিরূপণ করেন। জাবিরকে যে বাড়তি টাকা দেয়া হয়েছে তা বাইতুল মালের প্রাপ্য ছিল। ঋণের বিনিময় নয়।

৪. চতুর্থ হাদীস এ মাসআলার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। কেননা, এখানে উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, টাকা বাড়িয়ে দাও। বরং অর্থ হলো, উত্তম পন্থায় পরিশোধ কর। গড়িমসি করো না, ঋণদাতাকে বারবার ঘুরিয়ে দিও না। যা দিবে তা যেন ভালো হয়। এমন যেন না হয়, নিয়েছ ভালো জিনিস দেয়ার সময় খারাপটা দিলে।

ব্যবসায়ী সুদ এবং ভাড়া

ব্যবসায়ী সুদকে বৈধতা দানকারী ওকীলরা তৃতীয় আরেকটি দলিল করে থাকে। তা হলো, 'কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট'। যেমন- এক ব্যক্তি তার রিকশা, ভ্যান বা ট্যাক্সি লোকদেরকে এ শর্তে দেয় যে, তুমি দৈনিক এত টাকা আমাকে দিয়ে যাবে। এটা সর্বসম্মত বৈধ কাজ। এটাই তো ব্যবসায়ী সুদ। তাতে পুঁজির মালিক এ শর্তে তার পুঁজি দিয়ে থাকে যে, তুমি আমাকে নির্ধারিত অংকের টাকা প্রতি বছর দিয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তি যেমন তার বাহনকে ভাড়ায় খাটিয়েছে, এ পুঁজিপতিও তার পুঁজিকে ভাড়ায় খাটাচ্ছে। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখুন যে, উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য। রিকশা, ভ্যান, ট্যাক্সি ভাড়ায় দেয়া যায় কিন্তু নগদ ক্যাশকে ভাড়ায় দেয়া যায় না। কেননা ভাড়ার মর্মার্থ হলো, আসল জিনিসকে ঠিক রেখে অবশিষ্ট রেখে তার থেকে লাভ অর্জন করবে। আপনি কারও থেকে ট্যাক্সি ভাড়ায় আনলেন। ট্যাক্সি যেমন তেমনি থাকে। শুধু তার মাধ্যমে লাভ অর্জন করেন। নগদ ক্যাশে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা তাকে অবশিষ্ট রেখে তা থেকে লাভ কামাই করা যাবে না। তা থেকে লাভ কামাই করতে হলে তা ব্যয় করতে হবে। সুতরাং ভাড়ার সাথে তার তুলনা অবান্তর।

আচ্ছা, কিছুক্ষণের জন্য মেনেই নিলাম যে, ভাড়া আর ব্যবসায়ী ঋণ একই। তাহলে তো ব্যবসায়ী সুদ আর মহাজনী সুদ উভয়টি বরাবর হয়ে যাবে। ব্যবসায়ী সুদ যেভাবে ভাড়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল, তেমনি মহাজনী সুদকেও সামঞ্জস্যশীল করে দেখানো যায়। ভাড়ায় কিছু গ্রহণকারী ব্যক্তি সব সময় লাভজনক কাজে লাগানোর জন্য কোন কিছু ভাড়া নেয় না। কখনও নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্যও ভাড়া নিয়ে থাকে।

আপনি প্রতিদিন ট্যাক্সি ভাড়ায় নিয়ে থাকেন। এটা আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিয়ে থাকেন। সুতরাং ভাড়ার সাথে সুদকে তুলনা করা যদি সঠিক হয় তাহলে মহাজনী সুদকেও বৈধ বলতে হবে। অথচ সে সুদকে তারাও অবৈধ বলে থাকেন, যারা ব্যবসায়ী সুদের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে চান। অথচ কুরআনে কারীমে এর অবৈধতা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং নিজেরাই বিচার করে দেখুন যে, এ তুলনা সঠিক না কি ভুল। যদি সঠিক হতো তাহলে কুরআন তাকে অবৈধ ঘোষণা করতো না।

সলম[১] বিক্রি এবং ব্যবসায়ী সুদ

ব্যবসায়ী সুদকে বৈধতা দানকারীরা এটাকে সলম বিক্রির সাথেও তুলনা করেছেন। প্রথমে সলম বিক্রির অর্থ ভাল করে বুঝে নেয়া যাক।

যেমন- একজন কৃষক এক ব্যক্তির কাছে এসে বলল, আমি এখন গমের ফসল বুনছি। কিছু দিনের মধ্যে তা পেকে যাবে। কিন্তু এখন আমার কাছে টাকা নেই। তুমি এখন আমাকে টাকা দিয়ে দাও। ফসল পেকে গেলে আমি তোমাকে এত পরিমাণ গম দিয়ে দেব। এটাই হলো সলম বিক্রি।

একটু চিন্তা করুন, সলম এক ধরনের বিক্রি, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্তসাপেক্ষে স্পষ্টত বৈধতা দিয়েছেন এবং এটাকে ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যা আল্লাহ তাআলা أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ বলে হালাল করেছেন। এর বিপরীতে রিবাকে হারাম করেছেন। যারা রিবাকেও কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণার বিরুদ্ধে ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত বলে থাকেন, তারা কি নিজেরা নিজেদের কুরআন-হাদীস বিরোধীদের কাতারে দাঁড় করাচ্ছেন না? যারা বলেছিল- (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا) ফলে কুরআন তাদের জবাব দিয়ে ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা শুনিয়েছে।

সলম চুক্তি এবং রিবার মধ্যে এ হিসেবে আসমান-জমিনের পার্থক্য যে, সলম বিক্রিতে প্রথমে মূল্য দেয়ার ভিত্তিতে পণ্য বেশি অর্জন করার শর্ত লাগানো যাবে না। ফেকাহ'র সব গ্রহণযোগ্য গ্রন্থে সলমের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে-

---

[১]. যে বেচাকেনায় পণ্যের মূল্য নগদ দেয়া হয় এবং পণ্য বাকীতে হস্তান্তর করার অঙ্গীকার করা হয় তাকে بَيْعُ سَلَمٍ বলে।

بَيْعُ الْاَجِلِ بِالْعَاجِلِ-

অর্থাৎ বাকীতে পাওয়া যাবে এমন পণের বিক্রি নগদ মূল্যে।

বিস্তারিত শর্তসমূহ আলোচনা ছাড়াই এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রচলিত ধারণাও শর্তহীন ব্যবসা এবং কোন নির্ভরযোগ্য আলিম বা ফকীহ কোথাও এ শর্ত করেননি যে, এ চুক্তিতে পণ্য যেহেতু দেরিতে হস্তান্তর করা হবে সেজন্য বেশি পাওয়া উচিত। অথচ ব্যবসায়ী সুদের ভিত্তিই হচ্ছে এ শর্ত।

সময়ের মূল্য

তাদের একটি দলিল হলো, অনেক ফিকহবিদ আলিম নগদ বিক্রিতে পণ্য নিলে ১০ টাকা এবং বাকীতে পরিশোধের শর্ত করলে ১৫ টাকা নেয়াকে বৈধ বলেছেন। এ অবস্থায় ব্যবসায়ী শুধু সময় বৃদ্ধির কারণে ৫ টাকা বেশি ধরেছেন। যেমন- হেদায়া-মুবাবাহা অধ্যায়ে এসেছে–

اَلَا يَدُلُّ اَنَّهُ يُزَادُفِى الثَّمَنِ لِاَجَلِ الْاَجِلِ

এটা কি প্রসিদ্ধ নয় যে, সময়ের জন্য মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো যায়।

হেদায়ার এ লাইনটির উপর এ বিরাট ইমারত দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যখন সময়ের বিনিময়ে বাড়িয়ে নেয়া জায়েয তাহলে ব্যবসায়ী সুদেও তো একই অবস্থা। সেখানে সময়ের বিনিময়ে বাড়তি টাকা নেয়া হয়। কিন্তু তাদের এটা বুঝা উচিত যে, যে হেদায়া গ্রন্থে উপরের বাক্যটি লেখা রয়েছে সেই হেদায়া'র 'সুলেহ' অধ্যায়ে খুব স্পষ্ট বাক্যে লেখা হয়েছে–

وَذَالِكَ اِعْتِيَاضٌ عَنِ الْاَجِلِ وَهُوَ حَرَامٌ-

অর্থাৎ এটা সময়ের মূল্য নেয়া এবং তা হারাম।

হেদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা আকমলুদ্দীন বাবরকী (রহ.) তাঁর 'ইনায়াহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

رُوِىَ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَاهُ عَنْ ذَالِكَ ثُمَّ سَاَلَهُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا يُرِيْدُ اَنْ اُطْعِمَعهُ الرِّبَا-

বর্ণিত আছে, কেউ ইবনে উমর (রা.)কে (সময়ের বিনিময়ে মূল্য নেয়ার ব্যাপারে) প্রশ্ন করলে তিনি তখন নিষেধ করেন। সে আবার প্রশ্ন করলে তিনি বলেন– সে চাইছে যে, আমি তাকে সুদ খাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিই।
[হাশিয়াতু নাতাইহিল আফকার- ইনায়াহ : ৭ : ৪২]

এরপর ইয়ানাহ লেখক লিখেছেন– হযরত ইবনে উমর (রা.) এটা এজন্য বলেছেন যে, সুদ হারাম শুধু এজন্য করা হয়েছে যে, তাতে শুধু সময়ের বিনিময়ে সম্পদের লেনদেনের গন্ধ পাওয়া যায়। তাহলে যেখানে এটা গন্ধের গণ্ডি পেরিয়ে বাস্তবতায় পৌছে যায় সেখানে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কি আর সন্দেহ থাকতে পারে? তাছাড়া হানাফী মাযহাবের একজন উঁচু মানের আলেম কাজী খান, যিনি হেদায়া প্রণেতার সমশ্রেণীর, তিনি স্পষ্টই বলেছেন– বাকীর কারণে মূল্য বাড়ানো বৈধ নয়।

لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِثَمَنِ النَّسِيْئَةِ اَقَلَّ مِّنْ سِعْرِ الْبَلَدِ فَاِنَّهُ فَاسِدٌ وَاَخْذُ ثَمَنِهِ حَرَامٌ-

গমের বিক্রি বাকী হওয়ার কারণে যদি শহরের সাধারণ দরের চেয়ে কম মূল্যে করা হয়, তাহলে তাতে চুক্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং মূল্য নেয়া হারাম।

ফতোয়ায়ে আলমগিরীতেও এ ধরনের উদ্ধৃতি রয়েছে। তবে উলামাদের জন্য এখানে একটি প্রশ্নের সুযোগ থেকে যাচ্ছে, তাহলো হেদায়া গ্রন্থে দুই জায়গায় বিপরীতমুখী দুটো বক্তব্য কেন আসলো? প্রথম উদ্ধৃতিতে সময়ের বিনিময়ে মূল্য নেয়ার বৈধতা বুঝা যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে এর অবৈধতা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। উলামাদের জন্য এর জবাব বুঝা মুশকিল কিছু নয়।

পণ্যের ব্যবসায় বাকীর খেয়াল করে মূল্য কিছু বাড়িয়ে দেয়া তো সরাসরি সময়ের বিনিময় নয়; বরং পণ্যেরই দাম। পক্ষান্তরে সরাসরি সময়ের বিনিময় বার্ষিক বা মাসিক যদি সিদ্ধান্ত করা হয় তবে তা হারাম। যা হেদায়ার 'সুলেহ' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

যাদের ফেকার সাথে একটু সম্পর্ক আছে তাদের এ পার্থক্য বুঝতে কোন প্রশ্ন করা লাগবে না। কেননা তার অগণিত নজীর রয়েছে। কখনও কোন জিনিসের বিনিময় নেয়া সরাসরি অবৈধ। আবার তা অন্য পণ্যের আওতায় নিলে তখন আবার বৈধ হয়ে যায়। তার একটা নজীর এমন– প্রত্যেক বাড়ী, দোকান এবং জমির মূল্যে তার অবস্থানস্থলের এবং প্রতিবেশীর বড় একটা প্রভাব পড়ে। যার কারণে মূল্য নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। এক মহল্লায় একটা বাড়ি দশ হাজার টাকায় পাওয়া যায়। শহরের মধ্যস্থলে সমপরিমাণ বাড়ির মূল্য এক লাখ টাকায় পাওয়া গেলেও সস্তা মনে করা হয়। মূল্যের এ তারতম্য বাড়ি হিসেবে নয়; বরং তার বিশেষ আকার আকৃতি এবং স্থান হিসেবে। যখন কোন মানুষ এ বাড়ি বিক্রি করে বা কিনে তখন তার আকার আকৃতিও বিক্রি হয়ে যায়। আর যেটুকু মূল্য বেড়েছে তা ঐ আকার আকৃতিরই বিনিময়। অথচ এই আকার আকৃতি এবং স্থান কোন সম্পদ নয়, যার বিনিময় নেয়া যেতে পারে। কিন্তু বাড়ি বা জমি বিক্রির আওতায় এ আকার আকৃতি এবং স্থানের গুণগত মানের বিনিময়ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং তা বৈধ। তেমনি প্রত্যেক বাড়ির জন্য একটা রাস্তার অধিকার থাকে। প্রত্যেক আবাদী জমির জন্য পানি পাওয়ার অধিকার থাকে। যদি কেউ এ অধিকারকে হরণ করে বাড়ি বা জমি বিক্রি করে তাহলে তা অবৈধ হবে। কেননা অধিকার তো কোন সম্পদ নয়। কিন্তু বাড়ি বা জমি বিক্রি করতে এসবের প্রয়োজন আছে এবং তা বাড়ি ও জমির আওতায় অটোমেটিক বিক্রি হয়ে যাবে। বাড়ি ও জমির মূল্যের সাথে এর বিনিময়ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আমাদের আলোচ্য মাসআলায় চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যদি বাকীতে বিক্রির কারণে পণ্যের মূল্য বাড়ানোকে বৈধ হিসেবে মেনে নেয়া যায়, তাহলে তার নমুনা ওটাই যে, পণ্য মূল্যের আওতায় সময়ের ধারণায় পণ্যের মূল্য বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু যদি তাকে সরাসরি সময়ের বিনিময় ধরে নেয়া হয় তাহলে তা রিবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে অবৈধ হয়ে যাবে। সুতরাং হেদায়া প্রণেতা যেখানে সময়ের কারণে মূল্য বেড়ে যাওয়াকে বৈধ বলেছেন সেখানে প্রথম অবস্থা ধর্তব্য। অর্থাৎ সরাসরি সময়ের বিনিময় নয়; বরং পণ্যের আওতায় সময়কে শামিল করে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। (যদিও কাজী খান প্রমুখ এটাকেও অবৈধ বলেছেন)। আর যেখানে হেদায়া

প্রণেতা সময়ের বিনিময়ে মূল্য নেয়াকে অবৈধ বলেছেন, সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য হলো– সরাসরি সময়ের মূল্য নেয়া যায় না।

ব্যবসায়ী সুদে যেহেতু সময়ের মূল্য সরাসরি নেয়া হয় অন্য কিছুর আওতায় নয়, তখন এ অবস্থাটি সকল ফেকাহবিদের ঐকমত্যে অবৈধ এবং হারাম।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক দলিল

এসব দলিল প্রমাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন তাদের প্রাসঙ্গিক কিছু দলিলের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। যেগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির ক্ষেত্রে বুনিয়াদ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না ঠিকই, কিন্তু বড় বড় দলিলকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা রাখে। যদিও এসব দলিল পূর্বেকার দলিলগুলোকে অবান্তর করে দেয়ার পর আর কোন পাওয়ার রাখে না; তবুও পাঠকের পূর্ণ আস্থা নিশ্চিত করা এবং সব ধরনের সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত করার জন্য আমরা এ ব্যাপারেও কিছু বলতে চাই।

১. জনাব ইয়াকুব শাহ সাহেব হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে বলেছেন, মুহাদ্দিসীনগণ নিজেরা হাদীসের মূলনীতির গোড়াপত্তন করেছেন। ইবনে জাওযী লিখেছেন– ঐ হাদীস যাতে সামান্য ব্যাপারে ভীষণ শাস্তির ধমকি এসেছে অথবা সাধারণ সৎকাজে সীমাহীন সওয়াবের ওয়াদা এসেছে– সেসব সন্দেহযুক্ত। কুরআনে কারীম যেটুকু সাজা সুদখোরের জন্য নির্ধারণ করেছে, তা সম্ভবত আর কোন অপরাধীর জন্য বলেনি। এত বড় শাস্তি ব্যক্তিগত মহাজনী সুদের ব্যাপারে তো প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ী সুদ যেহেতু এত মারাত্মক কোন ব্যাপার নয় যে তার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা আসতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তি থেকে সুদ নেয়া মারাত্মক ব্যাপার। সুতরাং তার নিষেধাজ্ঞাও শক্ত ভাষায় হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যবসায়ী সুদের ব্যাপারে এ অপবাদ দেয়া যাবে না, এটা গ্রহণকারী দরিদ্র নয়। সে লাভবান হওয়ার জন্য ঋণ নেয় এবং সাধারণত সুদের চাইতে কয়েক গুণ বেশি লাভ অর্জিত হয়।

দলিলটির ভিত্তি ঐ ধারণার উপর যে, ব্যবসায়ী সুদ কোনভাবেই ক্ষতিকর নয়। ব্যবসায়ী সুদকে বৈধতা দানকারীদের অধিকাংশ দলিলের ক্ষেত্রে

দেখা যায় যে, সে সবের মূলে তাদের এ মানসিকতাই কাজ করছে। তাই আমরা মনে করছি, ব্যবসায়ী সুদে ব্যক্তিগত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কি কি ক্ষতি সাধিত হয় তার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসা জরুরি। (আল্লাহ তাআলাই তৌফিকদাতা)।

সুদের ধ্বংসলীলা

চারিত্রিক অবক্ষয়

সুদ হারাম হওয়ার একটি কারণ হলো, সে সব উত্তম চরিত্রসমূহকে দলিত করে স্বার্থ ধান্ধার চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। অন্তর থেকে দয়ার্দ্র অনুভূতিকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। অন্তরটাকে পাথরের মতো শক্ত ও কঠিন বানিয়ে দেয়। সম্পদের দুর্দান্ত মোহ এবং কৃপণতাকে শক্তি যোগায়। পক্ষান্তরে ইসলাম একটি এমন সুস্থ সমাজের গোড়া পত্তন করতে চায় যা দয়া-মায়া, মোহব্বত-ভালোবাসা, আত্মত্যাগ ও সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে সব মানুষ মিলে মিশে জীবন যাপন করবে। একের বিপদে অন্যে দৌড়ে যাবে। গরীব-দুঃখী ও অসহায় লোকদের সাহায্য করবে। অন্যের উপকারে নিজের উপকার, অন্যের ক্ষতিকে নিজের ক্ষতি মনে করবে। দয়ার্দ্রতা এবং বদান্যতাকে নিজের অভ্যাস বানাবে। সামাজিক উন্নতির বাইরে কিছুই বুঝবে না। মানুষের মধ্যে এসব গুণাবলী সৃষ্টি করে ইসলাম সেই মানবতা এবং মর্যাদাকে পূর্ণতার ঐ স্তরে পৌছে দিতে চায়, যেখানে অবস্থান করলে তাদেরকে সৃষ্টির সেরা বলে অভিহিত করা যায় এবং যেখান থেকে তাদেরকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে সুদ (চাই তা ব্যক্তিগত বা মহাজনী হোক অথবা ব্যবসায়ী হোক) যে চিন্তা চেনতাকে জন্ম দেয় তার মধ্যে এসব চরিত্র এবং গুণাবলীর কোন জায়গা নেই। ঋণদাতা মহাজন বা পুঁজিপতি যেই হোক, সে তার সুদ প্রাপ্তির চিন্তা করে ঠিকই। কিন্তু ঋণগ্রহীতা কী হালে আছে তার সার্বিক অবস্থা, ব্যবসায়ী অবস্থার কোন বিবেচনাই সে করবে না। তার সুদ তাকে দিতেই হবে। ব্যবসায় তার লাভ হোক বা লোকসান। এতে তার কিছুই আসে যায় না। তার অন্তরে ইচ্ছা জাগে যে, ঋণগ্রহীতার লাভ দেরিতে

অর্জিত হোক, তাহলে সময়ের গতিতে তার সুদও বাড়তে থাকবে। এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ক্ষতির কোন চিন্তাই তার হয় না। কেননা সে তো সর্বাবস্থায় তার সুদ পেয়ে যাচ্ছে। এটা ব্যক্তিস্বার্থকে এ পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যে, একজন পুঁজিপতি কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে সুদ ছাড়া ঋণ দিতে প্রস্তুত হতে পারে না। সে ভাবে যে, আমি এ বাড়তি পড়ে থাকা টাকা কেন একজন ব্যবসায়ীকে দেব না? এতে তো আমি ঘরে বসে নির্ধারিত পরিমাণ লাভ কামাই করতে পারবো। এ ধারণার কারণে যদি কারও ঘরে কাফন ছাড়া কোন লাশ পড়ে থাকে বা তার কোন আত্মীয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়, তবু সে তার কাছে এসে ঋণ চাইবে। তখন হয়তো সে দিতে পারবে না। ফলে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পদদলিত করে তার কাছে সুদ দাবী করবে। এসব অবস্থা জয় করে করে, হারামে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, হারাম খেতে খেতে অন্তর পাথরের মতো কঠিন হয়ে যায়। অন্তরের এ বদ অভ্যাসটি এমনভাবে বাসা বাঁধে যে, তখন আপনার প্রামাণ্য বক্তব্য এবং ওয়াজ-নসীহত কোন কাজে আসবে না। সুদখোর ধনী সে তার চারপাশে শুধু অর্থের খেলাই দেখতে পায়। এজন্য তখন তার ব্যাপারে আপনার এ অভিযোগও না আসা উচিত যে, সে আমাদের কথা কেন শোনে না? আমাদের ওয়াজ-নসীহত থেকে কেন শিক্ষা গ্রহণ করে না?

তারপর লোকেরা যখন দেখে যে, পড়ে থাকা অলস অর্থে এত লাভ! চুপচাপ বসে থেকে, হাত-পা না নাড়িয়ে অবশ্যম্ভাবী লাভ অর্জন করা যায়, তখন তাদের মনেও এ ক্ষেত্রে টাকা খাটানোর লিপ্সা জংলী আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এবং প্রসার লাভ করে। এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, অর্থ কীভাবে বাঁচানো যায়। এমনকি এ লিপ্সায় এবং এ নেশায় অবৈধ পন্থায় অর্থ কামাই করাতে উদ্যত হয়। আর কিছু না হোক, তার মধ্যে কমপক্ষে কৃপণতা তো তৈরি করে দেবে। এ ক্ষেত্রে সম্পদ জমা করার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি চায়, আমি অন্যের তুলনায় বেশি অর্থ কামাই করবো। পরবর্তীতে এ প্রতিযোগিতা সমাজে হিংসা-বিদ্বেষকে জাগিয়ে তোলে। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই শুরু হয়ে যায়। বন্ধুকে দেখে বন্ধু হিংসার অনলে জ্বলতে থাকে। পিতা সন্তানের এবং সন্তান পিতার ক্ষতি সাধন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকি 'আমি' আর 'আমার'-এর এ জিঘাংসা-সংকুল সমাজে 'মানবতা' ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর

কোলে ঢলে পড়ে। এটা কাল্পনিক কলমশিল্প নয়। আপনি আপনার চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখুন, আজ কি এসব সংঘটিত হচ্ছে না? আপনি বলতে বাধ্য হবেন– হ্যাঁ। আপনি যদি ন্যায়ানুগ দৃষ্টিতে তাকান, তাহলে এটাও আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এসবই 'সুদ' নামক বিষবৃক্ষের বিষাক্ত ফল। বিষাক্ত ফুল।

এখন যদি আমরা এ গযব থেকে পরিত্রাণ চাই, তাহলে সাহস করে এ বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করতে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যদি শুধু আত্মশুদ্ধি আর দাওয়াত ও তাবলীগের বয়ানের পন্থা অবলম্বন করেই ক্ষান্ত হই, তাহলে আমাদের উদাহরণ ঐ বোকার মতো হবে, যে তার শরীরের জায়গায় জায়গায় বের হওয়া ফোঁড়ার চিকিৎসা শুধু পাউডার মেখে সম্পাদন করতে চায়। এভাবে এ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে না, যতক্ষণ না মূল কারণ নির্ণয় করে তা ধ্বংস করবে। তেমনি আমরাও আমাদের সমাজকে ততক্ষণ সুস্থ করতে পারবো না, যতক্ষণ একে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত না করবো।

অর্থনৈতিক ক্ষতি

এখন দেখা যাক, সুদ অর্থনীতিকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে? অর্থনীতিবিদদের কাছে এটা কোন গোপন বিষয় নয় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, কৃষি এবং সব লাভজনক (PRODUCTIVE) কাজের উন্নতি এটা চায় যে, যত লোক কোন ব্যবসায় যে কোনোভাবে সম্পৃক্ত আছে, তারা সবাই এই ব্যবসাকে উন্নতি দেয়ার জন্য যেন সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা যেন এটা হয় যে, আমাদের এ ব্যবসা যেন দিন দিন উন্নতির দিকে যায়। ব্যবসার ক্ষতিকে নিজের ক্ষতি মনে করবে। যেন যে কোনো এক্সিডেন্টে তার প্রতিকার করতে সবাই একযোগে এগিয়ে আসে। ব্যবসার উন্নতিকে নিজের উন্নতি ধারণা করবে। এতে সবাই ব্যবসার উন্নয়নে পুরোপুরি আত্মনিয়োগে সচেষ্ট হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদা হলো, যারা ব্যবসায় শুধু পুঁজি দিয়ে অংশীদার হয়েছে, তারাও ব্যবসার লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে পুরোপুরি সজাগ থাকবে। কিন্তু সুদী ব্যবসায় এমন উন্নয়নশীল চেতনার

কোন ধার ধারা হয় না। এমনকি কখনও ব্যাপার একেবারে উল্টো ঘটতে দেখা যায়। একটু আগে যেমনটি বলা হয়েছে যে, সুদখোর শুধু নিজের লাভের চিন্তায়ই বিভোর থাকে। এর বাইরে তার কোন চিন্তাই নেই। ব্যবসা গোল্লায় যাক। লাভ হোক বা ক্ষতি হোক– তাতে আমার কি আসে যায়? আমার লাভ আমি পেলেই হলো। এমনকি সে এও কামনা করে যে, ব্যবসায় অনেক দেরিতে গিয়ে লাভ হোক। ফলে ব্যবসায়ী লাভ না আসার কারণে সুদ দিতে ব্যর্থ হবে। এতে সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে। এতে তার ব্যক্তিগত লাভ হবে। সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতি গোল্লায় যাক। যদি ব্যবসায়ীর ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে ব্যবসায়ী নিজে তার পুরো শ্রম ব্যয় করে তা দূর করার চেষ্টা করবে। কিন্তু পুঁজিপতি ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যবসা একদম দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে না পৌছবে। এসব ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি শ্রমদাতা এবং পুঁজিপতির মাঝে সহানুভূতিশীল সম্পর্কের জায়গায় শতভাগ ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে। যার ফলে অসংখ্য ক্ষতিকর ব্যাপার জন্ম নিচ্ছে।

১. পুঁজির একটা বড় অংশ এজন্য কাজে আসে না যে, তার মালিক সব সময় অপেক্ষা করে, কখন সুদের হার মার্কেটে বাড়বে। অথচ তার আরও অনেক বিনিয়োগের ক্ষেত্র আছে। অনেক শ্রমদাতা বিনিয়োগ পাওয়ার আশায় ঘুরে বেড়ায়। এ দ্বারা রাষ্ট্রীয় শিল্প এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আম জনতার অর্থনৈতিক অবস্থাও মন্দার কবলে পড়ে।

২. পুঁজিপতি যেহেতু সুদের হার কখন বাড়বে এ লালসায় জড়সড় হয়ে বসে থাকে, তাই সে তার পুঁজিকে যথাযথ ক্ষেত্রে খাটায় না; বরং ব্যক্তিস্বার্থকে সামনে রেখে পুঁজিকে লাগানোর বা আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এ অবস্থায় যদি পুঁজিপতির সামনে দুটো পথ থাকে, যেমন- কোন ফিল্ম কোম্পানীতে বিনিয়োগ করতে পারে বা গৃহহীন অসহায় লোকদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করে ভাড়ায় দেয়ারও সুযোগ তার সামনে আছে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, ফিল্ম কোম্পানীকে দিলে লাভ বেশি হবে, তাহলে সে ফিল্ম কোম্পানীকেই দেয়ার সিদ্ধান্ত নিবে। গৃহহীন লোকদের কী হলো না হলো তা তার হৃদয়কে স্পর্শও করতে পারবে না। এসব চিন্তা-চেতনা দেশ ও জনতার জন্য কত বিপজ্জনক তা কি ওরা কখনও ভেবে দেখেছে?

জনাব ইয়াকুব শাহ সাহেব এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন– এ ক্ষতির কারণ সুদ নয়। ব্যক্তি মালিকানা। যতদিন ব্যক্তি পুঁজিপতি থাকবে ততদিন পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের সুবিধানুযায়ী এবং নিজেদের লাভের কথা বিবেচনা করেই পুঁজি বিনিয়োগ করবে বা ফেলে রাখবে। [মাসিক সাকাফত : ডিসেম্বর-১৯৬১]

আমরা জনাব ইয়াকুব সাহেবের আশ্চর্যজনক এ বক্তব্যে হতাশ হয়েছি। তিনি যখন বলেন– এর কারণ সুদ নয় বরং ব্যক্তিমালিকানা, তখন তিনি বড় একটা ব্যাপার এড়িয়ে যান। ব্যক্তি মালিকানা এর মূল কারণ নয়। 'লাগামহীন এবং ব্যক্তিস্বার্থে উদ্দীপ্ত ব্যক্তি মালিকানা' এর একটা কারণ অবশ্যই। যে মালিকানা কোন ধরনের রীতিনীতির তোয়াক্কা করে না, তারাই পুঁজির সুবিধা অসুবিধার ভিত্তি বানায় ব্যক্তিস্বার্থকে। কিন্তু একটু আগে বেড়ে দেখুন যে, এই লাগামহীন এবং ব্যক্তিস্বার্থে উদ্দীপ্ত ব্যক্তি মালিকানার কারণ কী?

আপনি ইনসাফের দৃষ্টিতে চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, এর মূল কারণ হলো 'সুদ এবং পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা'। সুদের লিপ্সাই মানুষকে স্বার্থ-চেতনায় উজ্জীবিত হতে উৎসাহ যোগায়। এর ফলে সে তার পুরো সম্পদকে সব ধরনের আইন-কানুন থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। সব সময় ব্যক্তি-স্বার্থের ধান্ধায় ডুবে থাকে। কোন কল্যাণকর কাজে টাকা ব্যয় করার খেয়ালই তার নাগাল পায় না। এখন ঘটনাগুলোর যৌক্তিক ধারা এ রকম হয়ে গেল–

পুঁজি থেকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া স্বার্থবাদী ব্যক্তি মালিকানার জন্ম দেয় এবং এ ধরনের ব্যক্তি মালিকানা সৃষ্টির একমাত্র কারণ– 'সুদ এবং (পাশ্চাত্যের) পুঁজিবাদী অর্থনীতি।'

ফল কি দাঁড়াল? এ ধারাটাই মূলত আসল কারণ। এখন আপনিই বলুন যে, তাদের কথা কীভাবে ভুল প্রমাণিত হচ্ছে! যারা বলেছে, ব্যক্তিস্বার্থে পুঁজি খাটানো এবং আটকে রাখা সুদের কারণে হচ্ছে না; বরং ব্যক্তি মালিকানার কারণেই হচ্ছে। যদি আসলেই এ অকল্যাণ থেকে মুক্তি চাই তাহলে সর্বপ্রথম সুদ এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর হাত দিতে হবে। যতক্ষণ এটা হবে না ততক্ষণ মালিকানায় ব্যক্তিস্বার্থ এবং লাগামহীনতা

চলতেই থাকবে। যা উপরে আলোচিত সমস্যার মূল কারণ। এ অকল্যাণকে দূর করার পথ কী? পথ হলো– সুদী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে ইসলামী অর্থনীতিকে কার্যকর করতে হবে। যেখানে সুদ ঘুষ জুয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ রয়েছে। যাকাত, উশর, দান-খয়রাত এবং মীরাসের বিধান এ ধরনের স্বার্থবাদী চেতনা সৃষ্টিই হতে দেবে না। ইসলামের চারিত্রিক শিক্ষাকে বিস্তৃত করতে হবে। মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে হবে। যা মানুষকে সহযোগিতা এবং সামাজিক কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।

সুদ এবং পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা যা স্বার্থ-চেতনা সমৃদ্ধ ব্যক্তি মালিকানার প্রধান উৎস। তার পক্ষপাতিত্ব করে শুধু এই বলে ক্ষান্ত হয়ে গেলে যে, এসব অকল্যাণের আসল কারণ হলো– 'ব্যক্তি মালিকানা' এর সমাধান কীভাবে হবে?

৩. সুদখোর সম্পদশালী লোকেরা সোজাসুজি পন্থায় ব্যবসায়ী লোকের সাথে অংশীদারী ব্যবসায় যায় না। সোজাসুজি পন্থা হলো লাভ লোকসানের অংশীদারিত্ব। তাই সে ধারণা করে যে, এ ব্যবসায় ব্যবসায়ীর কত লাভ হবে? তাই সে সুদের নির্ধারিত হার ঠিক করে দেয়। আর সাধারণত সে তার লাভের হিসাব করার সময় বাড়িয়ে করে।

অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা তার লাভ লোকসান উভয় দিক বিবেচনায় রেখে কথা বলে। যখন ব্যবসায়ী ব্যক্তি লাভের আশা করে তখন পুঁজিপতির কাছে পুঁজি নিতে আসে। পুঁজিপতি এ সুযোগে সুদের হার এ পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যে, ব্যবসায়ী তার ভিত্তিতে ঋণ নেয়াকে অনর্থক ভাবতে বাধ্য হয়। ঋণদাতা ও গ্রহীতার এ দেন-দরবারের কারণে পুঁজি বাজারে আসার পরিবর্তে জমাট বেঁধে পড়ে থাকে। আর ব্যবসায়ীও বেকার থেকে যায়। আবার যখন বাজার দর পড়ে যায় এবং তা সীমা অতিক্রম করে এবং পুঁজিপতি নিজেই নিজের ধ্বংস দেখতে পায়, তখন সে সুদের হার কমিয়ে দেয়। ফলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। বাজারে পুঁজি আসতে থাকে। এই যে ব্যবসায়ী দুষ্টচক্র (Trade cycle) যার কারণে দুনিয়ার সব পুঁজিবাদী হতভম্ভ। চিন্তা করে দেখুন, এর একটাই কারণ। তাহলো ব্যবসায়ী সুদ।

৪. কখনও বড় বড় শিল্প-কারখানা এবং ব্যবসায়ী স্কীমের জন্য পুঁজি ঋণ হিসেবে নেয়া হয় এবং তার উপরও একটা বিশেষ হারে সুদ আরোপ করে দেয়া হয়। এ ধরনের ঋণ সাধারণ দশ, বিশ বা ত্রিশ বছরের মেয়াদে গ্রহণ করা হয়। পুরো সময়টার জন্য একই হারে সুদ নির্ধারণ করা হয়। তখন এ ব্যাপারটিতে দৃষ্টি দেয়া হয় না যে, সামনে বাজারের কি উথান পতন হবে? যতক্ষণ উভয় পক্ষ ভবিষ্যত দ্রষ্টা না হবে ততক্ষণ তো আর এটা জানা সম্ভব নয়। ধরুন, ২০০৯ সালে এক লোক বিশ বছরের জন্য ৭% হারে সুদের ভিত্তিতে বড় অংকের একটা পুঁজি ঋণ হিসেবে নিল এবং তা দিয়ে বড় কোন কাজে হাত দিল। এখন সে বাধ্য যে, ২০২৯ সাল পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী হারে সুদ দিতে থাকবে। কিন্তু যদি ২০১৮ সাল পর্যন্ত গিয়ে দেখা যায় যে, মূল্য পতন ঘটে বর্তমান দরের চেয়ে অর্ধেকে নেমে গিয়েছে, এর অর্থ হলো এই ব্যক্তি যদি বর্তমান বাজার দর হিসেবে আগের তুলনায় দ্বিগুণ মাল না বিক্রি করে তাহলে সে না সুদ পরিশোধ করতে পারবে, না কিস্তি পরিশোধ করতে পারবে। ফলে এই দর পতনের সময় হয়তো সে দেউলিয়া হয়ে যাবে অথবা সে এ মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর এমন কোন পথ বেছে নেবে। এ ব্যাপারে চিন্তা করলে প্রত্যেক ন্যায়বান বুদ্ধিমান ব্যক্তির সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বিভিন্ন সময়ে দরের উত্থান-পতনের মাঝেও পুঁজিপতিকে নির্ধারিত সুদী লাভ দেয়া না ইনসাফের চাহিদা আর না অর্থনৈতিক মূলনীতি হিসেবে এটাকে সঠিক বলা যায়। আজ পর্যন্ত এমন হয়নি যে, কোন ব্যবসায়ী কোম্পানী এ চুক্তি করেছে যে, আগামী বিশ বা ত্রিশ বছর পর্যন্ত ক্রেতাকে একটি নির্ধারিত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে থাকবে। এখানে যখন দীর্ঘ সময়ে একটা মূল্যহার প্রযোজ্য নয়, তাহলে সুদখোর ধনী শ্রেণীর কী বৈশিষ্ট্য আছে যে, তারা দীর্ঘ সময় ধরে বাজারের উত্থান-পতন সত্ত্বেও একই হারে সুদ আদায় করতে থাকবে?

আধুনিক ব্যাংকিং

পশ্চিমা সভ্যতা এমনিতে তো অনেক ধ্বংসাত্মক ব্যাপারে দৃশ্যমান কিছু উপকারের চাদর জড়িয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু তার এ কাজটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যে, সে সুদের মত একটা

ঘৃণ্য এবং ধ্বংসাত্মক ব্যাপারকে আধুনিক ব্যাংকিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে এবং তা মানুষের সামনে আকর্ষণীয় এবং দৃষ্টিনন্দন জামা পরিয়ে পেশ করেছে। এমনভাবে পেশ করেছে যে, বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকেরাও এটাকে ভালো বুঝে নিয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার এই নিকৃষ্ট দৃশ্যের আকর্ষণ মানুষের মন মগজে এমনভাবে ছেয়ে গিয়েছে যে, সে এর বিরুদ্ধে কিছুই শুনতে চায় না। সে এটাকে লাভজনক এবং সমাজহিতৈষী মনে করে। অথচ যদি সে পশ্চিমা প্রীতির বিষাক্ত চশমা খুলে ফেলে দিয়ে পুরো বিষয়টাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে তাহলে একজন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ শতভাগই এ সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হবে যে, সাধারণ মানুষের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে যে পরিমাণ দায়িত্ব বর্তমানে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর রয়েছে, ততটুকু আর কারও উপর নেই। আসল ব্যাপার হলো, পুরোনো ব্যবসানীতির ক্ষতি এত বেশি ছিল না যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয় আধুনিক সিস্টেমে। আমরা প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাংকের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করবো। ফলে কথা ভাল করে অনুধাবন করে কোন লক্ষে পৌছার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সংশয় যেন আর না থাকে।

কয়েকজন পুঁজিপতি একত্রে মিলে একটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এরা শেয়ার হিসেবে এখানে ব্যবসা করে। শুরুতে কাজ চালু করতে এরা নিজেদের পুঁজি খাটায়। কিন্তু ব্যাংকের মোট মূলধনের তুলনায় মালিকদের পুঁজি খুব সামান্য। ব্যাংকে যা মূলধন থাকে তার অধিকাংশই সাধারণ মানুষের আমানত। আসলে ব্যাংকের উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুঁজি এটাই। যে ব্যাংকে যত বেশি পুঁজি আমানতদারদের পক্ষ থেকে আসবে ততই সেটা শক্তিশালী ধরা হবে। যদিও আমানতদারদের পুঁজি ব্যাংকের মূল চালিকাশক্তি হয়, কিন্তু ব্যাংকের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের কোন হাত থাকে না। টাকা কীভাবে ব্যবহার করা হবে? সুদের হার কত নির্ধারণ করা হবে? ব্যবস্থাপক কাকে রাখা হবে। এসব ব্যাপার নির্ধারণ করার দায়িত্ব শুধু মালিকদের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমানতদারদের (DIPOSITORS) কাজ হলো টাকা জমা রেখে নির্ধারিত হারে সুদ নিতে থাকা। ব্যাংকের অনেক অংশীদার হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাংকের পলিসির ব্যাপারে তাদের কোন হাত থাকে না। তবে যাদের 'অংশ' (SHARES) অনেক বেশি তারা তাদের অংশীদারিত্বের বলে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কথা বলতে পারে। নীতি নির্ধারণে অংশ নিতে পারে। এই কতক বড় পুঁজিপতি নিজেদের খেয়াল খুশি মোতাবেক ব্যাংকের টাকা সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। একটা অংশ দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাখা হয়। কিছু পুঁজি বাজার ঋণ কিছু অন্য স্বল্পকালীন ঋণে ব্যয় করা হয়। এর বিপরীতে তিন বা চার শতাংশ সুদ ব্যাংক পায়।

একটি বড় অংশ ব্যবসায়ীদেরকে, বড় বড় কোম্পানীকে এবং অন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়। যা সাধারণ পুরো মূলধনের ৩০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ব্যাংকের আমদানীর সবচেয়ে বড় উৎস হলো এসব ঋণ। প্রত্যেক ব্যাংকের আশা এবং চেষ্টা হয় যে, তার বেশি থেকে বেশি টাকা ঐসব ঋণে যেন লাগে। কেননা তাতে সুদ অনেক বেশি আসে। এভাবে যে টাকা ব্যাংক অর্জন করে তা ব্যাংকের সব অংশীদারের মধ্যে যথা নিয়মে বণ্টন করে দেয়া হয়। যেমন সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

সাধারণ মানুষ তো সুদের লোভে এক এক করে সব টাকা ব্যাংকে জমা করে দেয়। আর এর পুরো ফায়দা গুটিকতেক পুঁজিপতি লুটে খাচ্ছে। এই ব্যাংক দরিদ্র এবং অল্প পুঁজির ব্যবসায়ীকে ঋণ দেয়া দূরের কথা, তারা সর্বদা টাকা বড় বড় ধনীদেরকে দেয় যারা তাদেরকে উঁচু হারে সুদ দিতে পারে। ফলে পুরো জাতির সম্পদ ঐ সুদখোর পুঁজিপতিদের মুষ্টিতে গিয়ে জমা হয়ে যায়। আর এরা ধনের বলে পুরো জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। দুনিয়ার রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে নিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিস তাদের দয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। পুরো দুনিয়ার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যক্তিস্বার্থের আলোকে রাজত্ব চালিয়ে যায়।

যখন একজন ব্যবসায়ী দশ হাজারের মালিক হয় তখন সে দশ লাখ টাকার পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে। যদি সে লাভবান হয় তাহলে সুদের কয়েক পয়সা ছাড়া পুরোটার সে মালিক হয়ে যায়। আর যদি লোকসান হয় তাহলে তার দশ হাজার গেল। বাকী নব্বই হাজার তো পুরো জাতির গেল, যা পূরণ করার কোন পথ নেই। এখানেই শেষ নয়। এসব পুঁজিপতি এখানেও দশ হাজারের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য একটা পথ খুলে রেখেছে। যদি

লোকসান কোন দুর্ঘটনার কারণে হয় তাহলে তো ক্ষতির পুরোটাই ইনস্যুরেন্স কোম্পানী থেকে পেয়ে যাবে। তাও আবার জাতির সম্পদ। মোট কথা, এসব পুঁজিপতির ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য গরীবদেরই টাকা কাজে লাগানো হয়। তারা তাদের টাকা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে জমা রাখে। আর পুঁজিপতিদের কারও আজ জাহাজ ডুবে গিয়েছে, কাল তার ফ্যাক্টরীতে আগুন লেগেছে। এখন গরীবদের টাকায় গড়ে ওঠা ইনস্যুরেন্স কোম্পানী তাদের ক্ষতি পোষানোর জন্য টাকা দেয়। আর যদি ব্যবসায়ী ক্ষতি বাজারের দর পতনের কারণে হয় তাহলে সে জুয়ার মাধ্যমে তা পুষিয়ে নেয়।

এখন লাভের অবস্থা শুনুন, যে ব্যাংক তার আমানতদার সাধারণকে প্রত্যেক বছর একশ'র বিনিময়ে একশ' তিন টাকা দিয়ে থাকে। কিন্তু আসলে এ তিন টাকাও বাড়তি কিছু সুদ নিয়ে ফিলাপ করে দেয়া হয় এবং সব টাকা মালিকদের পকেটে গিয়ে জমা হয়ে যায়।

যেসব পুঁজিপতি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে তারা এ সম্পদের কারণে পুরো বাজারের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নেয়। তারা যখন চায় দর বাড়িয়ে দেয়, যখন চায় কমিয়ে দেয়। যখন যেখানে চায় অভাব তৈরি করে দেয়। যেখানে চায় সেখানে তাদের লাভ কম দেখে সেখানকার বাজারে পণ্যের দর বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ ব্যাংক থেকে পাওয়া ঐ সুদের টাকা ব্যয় করে বাড়তি টাকায় পণ্য কিনে জীবন বাঁচায়। আর যেখান থেকে সুদ নিয়েছিল ঐসব পুঁজিপতির পকেটে আবার তা পৌছে দিয়ে আসে। এভাবে আমাদের ব্যাংকগুলো মূলত পুরো জাতির ব্লাড ব্যাংক বনে বসে আছে। যেখান থেকে এই পুঁজিপতি পুরো জাতির রক্ত চুষে চুষে ফুলে ফেঁপে উঠছে আর গোটা জাতি অর্থনৈতিক দিক থেকে আধমরা লাশ হয়ে পড়ে থাকে।

ব্যাংকের এ কার্যক্রম বুঝে নেয়ার পরও কি কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষের কাছে এটা লুকানো থাকতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা সুদী লেনদেনকারীদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা কেন শুনালেন?

একটি প্রাসঙ্গিক দলিল

জনাব জাফর শাহ সাহেব লিখেছেন–

ধরুন! এক ব্যক্তি ৮০০ টাকায় একটা মহিষ কিনলো। এটি দৈনিক দশ-পনের সের দুধ দেয়। সে তার মহিষ এক ব্যক্তিকে এ শর্তে দিল যে, তুমি এর সেবা করবে, তার দুধ, মাখন ইত্যাদি থেকে উপকৃত হও আর আমাকে দৈনিক চার পাঁচ সের দুধ দিতে থাক।

প্রশ্ন হলো– যদি এ ধরনের শর্তে সে মহিষ কারও হাওয়ালা করে দেয় এবং ঐ লোক তা মেনে নেয় তাহলে কি এ ব্যবসা ফিকাহর আলোকে অবৈধ হবে?

এ ব্যাপারে আমি আমার আশ্চর্য প্রকাশ করা ছাড়া আর কী করতে পারি! আমি জানি না জাফর সাহেবের সামনে এটা অবৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কী কারণ রয়েছে? আমাদের মতে, প্রশ্ন এটা নয় যে, এটা কোন ফিকাহর আলোকে বৈধ? যদি কোন ফেকাহর আলোকে এটা বৈধ হয় তাহলে অনুগ্রহপূর্বক অবগত করবেন। এখানেও যেহেতু একজনের লাভ সুনির্ধারিত এবং একজনের লাভ সন্দেহজনক। সুতরাং এটা সব ফেকাহতেই অবৈধ। হতে পারে মহিষ কোন দিন শুধু পাঁচ সের দুধ দিল এবং পুরোটাই মালিককে দিয়ে দিতে হলো এবং খেদমতগার কিছুই পেল না। বেকার খাটুনি দিল। এটা জুলুম। সুতরাং অবৈধ।

স মা প্ত